বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

বুক ইন্‌ডাষ্ট্রীজ
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

সুকবি, সুরসিক ও সুসমালোচক

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু

রবীন্দ্রনাথের জীবন এক মহাসমুদ্র। তাহার প্রতিদিনের ঘটনা এক একটি ইতিহাস। তাই তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থটি রচনা করিলাম। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে একটা সম্পূর্ণতার সুর বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠকদের মনে সেই সুর ধ্বনিত হইলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। ইহার উপাদানের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', 'শনিবারের চিঠি', বহু সাময়িক পত্র—দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক, ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'রবীন্দ্রজীবনী'র নিকট কৃতজ্ঞচিত্তে ঋণ স্বীকার করি।

গ্রন্থকার

কিশোর রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

মহামানব

যুগে যুগে আসিয়াছেন ভগবান, নানা রূপে নানা নামে এই পৃথিবীতে হইয়াছে তাঁহার অভ্যুদয়। যখন পাপে পূর্ণ হয় ধরণী, অধর্ম্মের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় তাহার সর্ব্বাঙ্গ, তখন এই মানুষের মধ্যেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জগতের সমস্ত গ্লানি তিনি হরণ করেন। এই পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু অসত্য, অসুন্দর, সামঞ্জস্যহীন, কুশ্রী ও বীভৎস সব দূর হয় তাঁহার আবির্ভাবে। তিনি মার্জ্জিত করেন মানুষকে। তাঁহার দর্শনে মানুষের চিত্ত উন্নত হয়, পরিশুদ্ধ হয়। তাঁহার স্পর্শে ধরণী ধন্য হয়। মানুষের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ—নরনারায়ণ, পুরুষোত্তম। আমরা তাঁহাকে বলি অবতার, ভগবানের প্রতীক। তাই বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য আমাদের দেবতা; আমরা তাঁহাদের পূজা করি।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব জাতির মধ্যে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। যে দেশ ও যে জাতির মধ্যে তিনি আসেন সে দেশ ও সে জাতির পরম সৌভাগ্য। তাহারা এই মহাপুরুষের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার ধর্ম্মে নিজেকে দীক্ষিত করিয়া স্বতন্ত্র এক জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এইভাবে যত মহাপুরুষ তত দল ও তত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীতে। প্রত্যেকেরই রীতিনীতি আচার-অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র; আর সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে গিয়া নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তাই এত পার্থক্য

জাতিতে জাতিতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, মানুষে মানুষে। এমন কি দেবমন্দিরের চেহারায় পর্য্যন্ত মিল নাই। ইহার এতটুকু অপমান বা অনাদর কোন জাতি কোন ধর্ম্ম কখনো সহ্য করে নাই। তাহার ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের কত পাতা যে রক্তাক্ত হইয়া আছে তাহার ঠিক নাই।

ইহা ভাল কি মন্দ তাহা আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। কিন্তু এই সব সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে যিনি তাঁহার কথাই বলিব। জানি না তিনি কোন্ দেবতা, জানি না তাঁহার স্থান কোথায়, কী জাত কী ধর্ম্ম তাঁহার; কোন্ নামে তাঁহাকে ডাকিব, কী দিয়া তাঁহার পূজা করিব। জগতে এমন সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আর কোন দেবতা ত আজ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। তবে কে বলিয়া দিবে তিনি কোন্ দেবতার দেবতা! বহু জন্মের তপস্থার ফলে যাঁহাকে বাঙ্গালী লাভ করিয়াছে কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারে নাই কোন ধর্ম্ম কোন জাতির বন্ধনে, জন্মভূমির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, তিনি সকল দেশ সকল কাল অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন দূরে—বহু দূরে—আকাশ যেখানে সীমাহারা, সপ্ত সমুদ্র যেখানে কূলহীন; যেখানে নিবিড় অরণ্যানী, যেখানে অনন্ত তুষার, যেখানে দুস্তর মরুভূমি; যেখানে সহরের সভ্যতা, যেখানে পল্লীর শ্যামচ্ছায়া; যেখানে ধনীর অট্টালিকা, যেখানে নির্ধনের কুটীর—সর্ব্বত্র! তাঁহার নাম দিকে দিকে আলোকে বাতাসে; মৃত্তিকার মাঝেও যেন তিনি পরিব্যাপ্ত। যেখানে জ্ঞানের আলো, প্রতিভার দীপ্তি, প্রেমের জ্যোতি সেইখানেই তিনি!

কে সেই ধরণীর সন্তান, যিনি অতুলনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তিতপূর্ব্ব—যাঁহার পরিচয় তিনি নিজেই,—তিনি কি মানুষ, আমাদেরই মত? কিংবা প্রকৃতির বিস্ময়—ওই অভ্রংলিহ হিমালয়ের মত, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ

সুবিশাল সমুদ্রের মত অথবা অসংখ্য জ্যোতিষ্কপুঞ্জশোভিত উদার অন্তহীন আকাশের মত ?

না, উহাদের অপেক্ষাও বিস্ময়কর তিনি—তিনি মানুষ !—আর আমাদের এই বাংলা দেশের মানুষ। তাঁহাকে চোখে দেখিয়া তোমরা অনেকেই হয়ত চক্ষু সার্থক করিয়াছ, তাঁহার কথা শুনিয়া তোমাদের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া তোমাদের জীবন ধন্য হইয়াছে। বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর গৌরব এই মহামানবের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তিনি যে কত বড় ছিলেন তাহা বুঝাইয়া বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি যে, পৃথিবীর যেখানে তিনি গিয়াছেন সেইখানেই পাইয়াছেন শ্রদ্ধা ভক্তি আদর অভ্যর্থনা—কল্পনাতীত, দেবদুর্লভ !

রটারডামে তিনি যখন প্রথম পদার্পণ করেন, সেখানকার দেশবাসীরা তাঁহাকে কী দিয়া অভ্যর্থনা করিবে কোথায় বসাইলে তাঁহার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শিত হইবে ভাবিয়া না পাইয়া খৃষ্টানদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গির্জ্জার বেদীর উপর রবীন্দ্রনাথকে বসিতে দিল। আমাদের কাছে দেবদেবীর মণিকোঠা যেমন পবিত্র, খৃষ্টানদের কাছে এই বেদী তেমনি। তবুও যেখানে ভগবান যীশুখৃষ্টের পুণ্য আসন সেখানে তাহারা একজন মানুষকে, আমাদের রবীন্দ্রনাথকে, বসাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে নাই। কী চোখে তাহারা কবিকে দেখিয়াছিল তাহা আমাদের মত ক্ষীণচেতা ধর্ম্মভীরু বাঙ্গালীর আজও বুদ্ধির অগোচর হইয়া আছে।

আবার যেদিন তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন তাঁহাকে শুধু একবার চোখে দেখিবার জন্য দূরদূরান্তর হইতে অগণিত নরনারী, বৃদ্ধ তরুণ তরুণী, ছুটিয়া আসিয়াছিল সেখানে। যাহারা দরিদ্র, হোটেলে কিংবা

কোন বাড়িতে থাকিবার মত সামর্থ্য যাহাদের ছিল না, তাহারা কেহ একদিন কেহ বা দুইদিনের পথ পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া পথের দু'ধারে ভীড় করিয়া বসিয়া ছিল শুধু আমাদের রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করিবার জন্য। শীতকে তাহারা গ্রাহ্য করে নাই, পথশ্রমে ও অনাহারে তাহারা কাতর হয় নাই—ফুটপাথের উপর ভিক্ষুকদের মত কেহ কেহ সারাদিন সারারাত ধরিয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল।

জার্ম্মেনীতেও এই অবস্থা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথকে ঘিরিয়া ধরিয়া নরনারীর সে কী ব্যাকুলতা! কেহ তাহার ছেলেকে শুধু আঙ্গুল দিয়া একবার স্পর্শ করিতে বলে, কেহ বা পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কবির জামার প্রান্ত চুম্বন করে, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে বলে। যেন তিনি দেবদূত, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্পর্শে পবিত্রতা, তাঁহার দর্শনে মানুষের কল্পনাতীত সৌভাগ্য। আজ বলিতে গর্ব্বে বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে যে এই মানুষটি জন্মিয়াছেন আমাদের দেশেই!

মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে ইটালীর নরনারীরা যখন প্রথম দেখিয়াছিল তখন সেখানে সে কি চাঞ্চল্য! ভীড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন রমণী শুধু 'দি প্রেজেন্স্' এই কথাটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অচৈতন্য হইয়া পড়েন। ইটালীতে পোপকে লোকে ভগবানের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। রাজার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নাই তাঁহার কথার উপর কথা বলিবার। এহেন পোপ যিনি, তাঁহার দর্শনলাভ সাধারণের কাছে কল্পনাতীত সৌভাগ্য। তিনি সর্ব্বদা নিজেকে দূরে রাখেন। ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ হইতে তিনি বাহির হন বছরে একবার, নয়ত বড়জোর দুইবার। তাই পোপের উপস্থিতিকে ইটালীর লোকেরা 'দি প্রেজেন্স্' বলিয়া থাকে। তাঁহাকে একটিবার দর্শন করিলেই হৃদয়মন পবিত্র হয়, জীবন ধন্য

হয়। রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাই তাঁহাদের মনে তখন এই পোপের কথাই স্মরণ হইয়াছিল!

আমাদের দেশের কোন রাষ্ট্রনায়ক তাঁহার ইটালীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন ইটালীতে গিয়া একটা জিনিস দেখিয়া তিনি যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন যে রাস্তা দিয়া গিয়াছেন তাহার দু'ধারে অবস্থিত অতি সাধারণ দোকানগুলিতে পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়াছিলেন একখানি রবীন্দ্রনাথের ছবি ও একখানি মুসোলিনীর ছবি—বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ত কথাই নাই! তাহা ছাড়া এই একই দৃশ্য তিনি দেখিয়াছেন ধনীর অট্টালিকায়, দেখিয়াছেন দরিদ্রের কুটীরে। বাস্তবিক একথা ভাবিলে দেহ বারবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে যে বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশের চেয়ে অধিকতর শ্রদ্ধা পাইয়াছেন বিদেশ হইতে। প্রদীপের আলোয় যখন চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে তখন তাহার ঠিক নীচেই জমিয়া থাকে অন্ধকার।

শোনা যায় একবার নাকি তিনি কোন রাজ্যের উপকূল দিয়া সমুদ্রে পাড়ি দিতেছিলেন আমেরিকার দিকে। এই সংবাদ যখনই সেখানকার রাজসভায় গিয়া পৌঁছিল অমনি সেখানকার সমস্ত রাজকার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ যে তাহাদের দেশের নিকট দিয়া যাইতেছেন ইহাতে তাহারা ধন্য হইয়াছে, তাহাদের দেশ ধন্য হইয়াছে, তাই তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমস্ত-কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

ইহা ছাড়া তিনি যখন যেখানে গিয়াছেন এমন সম্মান পাইয়াছেন যাহা পৃথিবীর অন্য কোন মানুষের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার নিজের রাজ্যে নিজের প্রজাদের মধ্যে বিরাট উৎসব সাড়ম্বরে

অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি; দেবতার পূজাও নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য উপচারে ও অজস্র উপকরণে নিবেদিত হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু যিনি রাজাও নয়, দেবতাও নয়, অথচ তাঁহাদের চেয়ে শতগুণ বেশী সমারোহে বিপুল অভ্যর্থনা যিনি পাইয়াছেন তিনি আমাদের এই কবি রবীন্দ্রনাথ! জগতে আরো বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু জীবিতকালে এমন সার্ব্বভৌম খ্যাতি আর কাহারো ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।

পৃথিবীর যেখানে তিনি পদার্পণ করিয়াছেন—বিলাত, আমেরিকা, চীন, জাপান, রাশিয়া প্রভৃতি সুদূর অঞ্চল হইতে পারস্য, সিংহল, এমন কি জাভা, বলি, সুমাত্রা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত—কোথাও ইহার অন্যথা কখনো ঘটে নাই। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে তাঁহাকে শুধু দর্শন করিবার জন্য। তাঁহার নাম শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র সকলের মনে সমানভাবে সম্ভ্রম ও বিস্ময় জাগাইয়া তুলিয়াছে। জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় এই প্রথম ও এই শেষ!

সেদিন যখন রবীন্দ্রনাথ পারস্যের শাহ্ রেজা খাঁ পল্লবী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার রাজ্যে গমন করিয়াছিলেন তখন এক বেদুইন সর্দ্দার ঘোড়া ছুটাইয়া বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মরুবাসীদের অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধাঞ্জলি আনিয়া কবির চরণে নিবেদন করিয়াছিল।

একবার বিখ্যাত ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস চীনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় একদল দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের হাতে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক বলিয়া জানিতে পারিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। অবশ্য ইহার জন্য ভূপর্য্যটককে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। ডাকাতরা একখানি ইংরাজী গীতাঞ্জলি আনিয়া

উপরে যে বাংলায় লেখা লাইন ছিল তাহা তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছিল এবং উহা তাঁহাকে পড়িতে দেখিয়া তবে মুক্তি দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই কত বড়, এই লেখা পড়িয়া অনেকের মনে হয়ত তাহা ঠিক বিশ্বাস নাও হইতে পারে; কারণ যাহা সারা বিশ্বে অভিনব, অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় তাহা এককথায় মানিয়া লইতে এই বৈজ্ঞানিক যুগে লোকে স্বভাবতই একটু দ্বিধা বোধ করিবে। কিন্তু কবির সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে কলিকাতার টাউনহলে সেদিন যে রবীন্দ্র-প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহা যাঁহাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের বোধ করি একথা আর বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

সেদিনের স্মৃতি মনে পড়িলে সারাদেহ আজও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ যে কত বড় এবং বাঙ্গালী জাতিকে যে তিনি কত উঁচুতে তুলিয়াছেন তাহা সেদিন চাক্ষুষ দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণের দেহে অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন আমিও সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীকে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথের দেহে। সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ মানুষ যেন দেখিতে দেখিতে আমার চোখের সম্মুখে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িলেন। দেখিলাম রাশিয়ার জার তাঁহার মাথায় গৌরবমুকুট পরাইয়া দিলেন; চীনের সম্রাট তাঁহার কণ্ঠ বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিলেন; কাইজার জার্ম্মেনীর শ্রেষ্ঠ উপহার আনিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন; আমাদের মহামান্য সম্রাট ব্রিটিশজাতির শ্রেষ্ঠ উপাধি তাঁহাকে দান করিয়া সাম্রাজ্যের গৌরববর্দ্ধন করিলেন—আরো দেখিলাম কত উপঢৌকন, কত মানপত্র যে টাউন হলের একটি বড় ঘরে সাজানো রহিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে! সেই ঘরের দেওয়ালে, মেঝেয় তাহাদের স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল রাষ্ট্রের রাজা মহারাজা জ্ঞানী গুণীরা সেইগুলি উপহার দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে।

আবার সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আর একটি ঘরে ঢুকিতেই বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রনাথের বই। পৃথিবীতে যে এতরকমের ভাষা আছে তাহা যেন সেদিনই প্রথম জানিলাম! আরো দেখিলাম কতকগুলি বই এমন হিজিবিজি ও অদ্ভুত অক্ষরে ছাপা হইয়াছে যে তাহার পাঠোদ্ধার আমাদের দেশে প্রথমে কাহারো দ্বারা সম্ভব হয় নাই। সে ভাষার নাম পর্য্যন্ত হয়ত এখানকার কেহ জানে না। ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেদিন যে গর্ব্ব ও যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। যাঁহার বই জগতের প্রায় সকল ভাষাতেই অনূদিত হইয়াছে বিশ্বসাহিত্যে তাঁহার স্থান যে কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়।

তারপর আর একটি ঘরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের তুলিতে রূপায়িত রবীন্দ্রনাথের ছবি সেখানে শোভা পাইতেছে। তাঁহার নানা বয়সের ছবি, নানাভাবে নানাভঙ্গীতে তোলা। তাহার কতকগুলি আবার জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের সঙ্গে একসঙ্গে তোলা ফটো। আমাদের রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বে বসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেই সব মনীষীদের চোখমুখ যেন গৌরবে উদ্ভাসিত!

রবীন্দ্রনাথের এই সপ্ততিতম জন্মোৎসবকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ 'গোল্ডেন বুক অব্ টেগোর' বাহির করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় বিরাট পুরুষ তাহা এই বিরাট গ্রন্থখানি দেখিলে কতকটা অনুমান করা যায়। মহাভারতের মত একখানি বৃহদায়তন পুস্তক—তাহার অসংখ্য সোনালী রঙের পাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে পূর্ণ।

বইখানি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। মনে হইল যেন ইহা একটি

বিরাট স্বর্ণমন্দির, জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ইহার কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন আর পৃথিবীর মহত্তম মনীষীদের পূজার ফুল ও বিল্বপত্রে ইহার বেদী ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে মনে প্রণাম করিলাম সেই দেবতার শ্রীচরণে, বিশ্বলোক যাঁহাকে পূজা করিয়াছে।

জার্ম্মেনীর বিখ্যাত দার্শনিক কাউণ্ট কাইসারলিঙ্ বলিয়াছেন, হাজার বছরের মধ্যে এইরকম কবি পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুধু যে বাংলা তথা ভারতবর্ষ ধন্য হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার আবির্ভাবে পৃথিবীর সকল দেশই কৃতার্থ হইয়াছে। ভারতবাসীর মত জগতের সবাই তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করে। তাই ভারতের পরাধীনতায় অন্য জাতির বুকেও গভীর বেদনা জাগে। একবার আমেরিকার বিখ্যাত লেখক উইল ড্যুরাণ্ট তাঁহার রচিত একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিবার সময় তাহাতে লিখিয়া দিয়াছিলেন —You are the only reason why India should be free.

রবীন্দ্রনাথ যখন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বলিদ্বীপে গিয়াছিলেন তখন সেখানকার প্রধান ডচ্ রাজপুরুষ শ্রীযুত কারণ সুনীতিবাবুকে বলিয়াছিলেন, দেখিবেন, উঁহার স্বাস্থ্যের যেন কোন হানি না হয়; আপনার দায়িত্ব বিশেষ গুরুভার, কারণ রবীন্দ্রনাথ কেবল আমাদের দেশের নহে, উনি সমগ্র মানবজাতির।

এতবড় কথা বোধ হয় আর-কোন মানুষের সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন লোকে কোনকালে বলে নাই! এতবড় সম্মান বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেহ কোনদিন পায় নাই। জাতিনির্ব্বিশেষে, ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের যিনি আপন, তিনি যে কতবড় তাহা এ যুগের আত্মসর্ব্বস্ব ও স্বার্থপর পৃথিবীর দিকে তাকাইলে বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক আজ যেখানে জাতিতে জাতিতে মিল নাই, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মিল নাই, মানুষে

মানুষে মিল নাই, সেখানে তিনি কোন্ শক্তির বলে সকলের অন্তর অধিকার করিলেন? এই চির-অমিলের জগতে তিনি কোন্ মিলনের বাঁশী বাজাইলেন, তাহাতে কী সুর ছিল কী জাদু ছিল—তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা জানেন! যিনি শুধু কবি, যিনি কথার জাদুকর, যিনি ছন্দে সুরে মালা গাঁথেন, তিনিই কি তবে জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষ? আজ যে শক্তি জগতে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছে, যে শক্তির প্রভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অকালে অকারণ মৃত্যুবরণ করিতে হইতেছে—তিনি কি তাহারও ঊর্দ্ধে?

হাঁ। তাই তিনি বিশ্ববাসীর অন্তরে স্থান পাইয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন ভালবাসিয়া মানুষকে বশ করা যায়, বলপ্রয়োগে নয়; বাঁশীর শক্তি অসির চেয়ে অনেক বেশী। তাই যুগে যুগে কত নেপোলিয়ন, কত নীরো, কত জার, কত চেঙ্গিজ খাঁ, কত নাদির শার দল আসিয়াছে কিন্তু কেহই সমগ্র পৃথিবীকে কোনদিন জয় করিতে পারে নাই, সমগ্র মানবজাতির মনে কোনদিন তাহাদের স্থান হয় নাই; অথচ, বাল্মীকি, হোমার, গায়টে, শেক্সপীয়ার প্রভৃতি কবিরা আজও অমর হইয়া আছেন মানুষের মনে।

রবীন্দ্রনাথও কবি। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যজগতে অতুলনীয়। কোন দেশ কোন কালের গণ্ডী দিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখা যায় না। তিনি সকলের ঊর্দ্ধে। তাঁহার কাব্যের ধ্বনি শুধু বাহির হইতে কর্ণে প্রবেশ করিয়া শ্রুতি পরিতৃপ্ত করে না, ইহা মানুষের অন্তরে এমন অনুরণন জাগাইয়া তোলে যাহাতে নিখিল বিশ্বের সর্ব্বযুগের মানব-মনের সুর গুঞ্জরিত। যাহা কিছু সত্য, যাহা চিরসুন্দর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাহা মানুষ খুঁজিয়া পায়। তাঁহার সাহিত্য শুধু বাংলাদেশ বা বাংলাভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, ইহা দেশ কাল পাত্রের অতীত হইয়া সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। তিনি

বিশ্বকবি। ভগীরথের মত শঙ্খ বাজাইয়া একমাত্র তিনিই বিশ্বজনীন চিন্তাধারাকে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের অঙ্গনে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দূরকে নিকটে আনিয়াছেন আবার নিকটকে দূরে লইয়া গিয়াছেন; যাহা প্রাচ্যের তাহাকে তিনি প্রতীচ্যে লইয়া গিয়াছেন আবার যাহা প্রতীচ্যের তাহাকে তিনি প্রাচ্যে লইয়া আসিয়াছেন। এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার মিলন-সাধনার চিরসাধক রবীন্দ্রনাথ। এই জগৎস্থষ্টির মূলে যে চিরসুন্দর তাঁহাকে তিনি দেখিয়াছেন সর্ব্বত্র। তিনি চিরন্তন সত্যসাধনার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমের কোন ভেদ রাখেন নাই। তাই সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তিনি জগদ্বাসীর অন্তরে অক্ষয় শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের ইহাই বৈশিষ্ট্য; তাই তিনি ঋষিকবি।

কবি নামে কীর্ত্তিত হইলেও রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতাই লিখিতেন না। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই যাহা তাঁহার করস্পর্শে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই। গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান, কবিতা প্রবন্ধ, চিঠি, ভ্রমণকাহিনী—এককথায় সাহিত্য বলিতে যাহা কিছু বুঝায়—তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া স্বষ্টি করিয়াছেন তিনি। আজ রবীন্দ্র-সাহিত্যের চেয়ে সুন্দরতর সাহিত্য কল্পনারও অতীত। তাঁহার অস্খলিতগতি লেখনী ও অসাধারণ স্বজনশক্তি বাংলাসাহিত্যকে পূর্ণতা দান করিয়াছে—ফুল আজ ফলে পরিণত হইয়াছে, নদী সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ললিতকলার সকল বৈচিত্র্য সকল মাধুর্য্য সকল সৌন্দর্য্য স্বচ্ছন্দধারায় তাঁহার অন্তরে স্বত-উৎসারিত। শুধু সাহিত্য-স্বষ্টি নয়—বক্তৃতা, সঙ্গীত ও অভিনয়ে পর্য্যন্ত তিনি চরম ঔৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেন কোন অমরার সুর ছিল তাই বারবার তাহার ধ্বনি শুনিয়াও মানুষের আশা মিটিত না,

সর্ব্বদা একটা অতৃপ্তির বেদনা জাগিয়া থাকিত মনে। জার্ম্মেনীতে তিনি যখন প্রথম বক্তৃতা দেন তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর শুনিয়া শ্রোতাদের দেহ বারবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল। লোকে চিরদিন উৎসুক আগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া থাকিত শুধু তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিবার জন্য। লণ্ডন, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালী সর্ব্বত্রই এমনি হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শেষ পরিণতি হইয়াছে চিত্রকলায়। যাহাকে তিনি ছন্দে রূপ দিতে পারেন নাই, সুরে ধরিতে পারেন নাই, কণ্ঠে বলিতে পারেন নাই, তাহাকে বাঁধিলেন রেখায়। সেই অ-ধরা রূপ, সেই সুদূরপ্রসারী কল্পনার শেষ ঐশ্বর্য্য তিনি নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন ছবির মধ্যে। তাই সাধারণে তাঁহার ছবির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলেও জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মনে তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে যাইয়া একবার তাহার সম্পাদক বিখ্যাত চিত্রসমালোচক সর্ব্বজনসমক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, Doctor Tagore, your pictures will be a lesson to the artists of the world!

রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতে একদিন এই কথা শুনিবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গিয়াছিল, চক্ষু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল!

বাস্তবিক বড় প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে মনকেও বড় করিতে হয়, তা না হইলে বড় ও ছোটর পার্থক্য কোথায়? রবীন্দ্রনাথ বরাবর কল্পনার জগতে তিরিশ বৎসর অগ্রসর হইয়া আছেন। তাই আমাদের দেশের লোকেরা সর্ব্বদা তাঁহাকে তিরিশ বৎসর পরে বুঝিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হয়। আজ যাহারা তাঁহার ছবি বুঝিতে পারিল না, তাহাদের দুঃখ করিবার কিছু নাই। শীঘ্রই এমন দিন

আসিবে যখন তাহারা বুঝিতে পারিবে যে রবীন্দ্রনাথের এই ছবি তাঁহার কবিতারই রূপান্তর মাত্র। তাহার রেখায় কবিতার ছন্দ, তাহার বর্ণে কবিতার সুষমা, তাহার ভাবে ঋষিকবির ধ্যান ও চিন্তা!

রবীন্দ্রনাথ আজীবন সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। তাই জগদ্বাসী সুন্দরের প্রকাশ দেখিয়াছে তাঁহার মধ্যে। তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর, তাঁহার কণ্ঠস্বর সুন্দর, তাঁহার গঠন সুন্দর, তাঁহার বচন সুন্দর, তাঁহার ভঙ্গী সুন্দর, তাঁহার রচনা সুন্দর, তিনি সুন্দরেরই প্রতিরূপ। বিলাত আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের বহু মনীষী তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছেন, যীশুখৃষ্টকে কখনো চোখে দেখি নাই, শুধু বর্ণনা শুনিয়াছিলাম; আজ মনে হইতেছে চোখের সম্মুখে তাঁহাকে দেখিয়া যেন জীবন সার্থক হইল!

আরো কত বলিব? রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে কাহিনীর অন্ত নাই! পৃথিবীর কত দেশে কত লোকের কাছে তাহা ছড়াইয়া আছে কে জানে! জার্ম্মেনীর বিখ্যাত দার্শনিক কাইসারলিঙ্ লিখিয়াছেন, কিছুদিন পূর্ব্বে এক অতি বৃদ্ধ ফরাসী লিপিতত্ত্ববিদ্ তাঁহার কাছে আসিয়াছিলেন মহান্ ব্যক্তিদের কিছু হস্তলিপির সন্ধানে। জগতের বহু মনীষীর চিঠিপত্র যাহা তাঁহার কাছে ছিল তিনি তাঁহাকে দেখাইলেন একখানি একখানি করিয়া, কিন্তু দেখিয়া কোনটিই তাঁহার মনঃপূত হইল না। সবশেষে যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর দেখাইলেন, সেই বৃদ্ধটি তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বয়স রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি হাতে করিয়া বলিতে লাগিলেন—How beautiful and how noble! I know of no handwriting of this level since the great days of European Renaissance!

মোটকথা এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানুষ জগতে কখনো কোন যুগে

জন্মগ্রহণ করে নাই। রবীন্দ্রনাথ তাই এ পৃথিবীর বিস্ময়! তিনি যেন ঠিক পৃথিবীর মানুষও নন, আবার স্বর্গের দেবতাও নন। তিনি স্বয়ং এক নূতন জগৎ, যেখানে চির আনন্দ ও চির শান্তি বিরাজমান; যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধে কোন ভেদাভেদ নাই— যেখানে ক্ষমতার দম্ভ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ নাই—মানসলোকেই যাহার বিকাশ, রসানুভূতিতে যাহার পরিপূর্ণতা!

তিনি প্রথম দেখাইলেন যে এমন এক দিন ছিল যখন সকলের ধমনীতে একই রক্তপ্রবাহ বহিত—শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার। এক অচ্ছেদ্য শিক্ষার ঐক্যবন্ধনে সকল মানুষ আবদ্ধ ছিল যখন প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবনে প্রভাতে সন্ধ্যায় মুনিঋষিদের কণ্ঠে উদাত্ত সুরে সামমন্ত্র উদ্গীত হইত। আজ সেই অখণ্ড উদার শিক্ষার ধারা হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে এত বৈষম্য এত পার্থক্য দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে।

রবীন্দ্রনাথ সেই সুমহান প্রাচীনকে বর্ত্তমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন—তাহা দর্শন করিয়া সারা বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে তাই ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন দেশে লোকে পূজা করে। কাহারো কাছে তিনি গুরুদেব, কাহারো কাছে কবিগুরু, কাহারো কাছে ঋষি, কাহারো বা কাছে অবতার। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই, এমন কি গান্ধিজীও তাঁহাকে গুরুদেব বলিয়াছেন। তিনি সকলের গুরু, সকলের জ্ঞানদাতা। কিন্তু তিনি এত বড় যে কোন সংজ্ঞার দ্বারা তাঁহার প্রতিভার পরিমাপ হয় না; তিনি এ সকলেরও অতীত। তিনি সার্থকনামা পুরুষ। আকাশে যেমন সূর্য্য, পৃথিবীতে তেমনি রবীন্দ্রনাথ! সূর্য্যের মতই বিরাট, সূর্য্যের মতই জ্যোতির্ম্ময়

তিনি। সূর্য্য যেমন এই সৌরজগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবনীশক্তি দান করিয়াছেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ তেমনি সমগ্র মানবজাতির মনকে আলোকিত করিয়াছেন প্রাণবান করিয়াছেন। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া

'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।'

বলিয়া সূর্যদেবকে প্রথম প্রণাম করিবার প্রথা আমাদের শাস্ত্রে আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও একথা স্বীকার করিয়াছেন যে, Ultra-violet Ray বা বেগ্নীপারের আলো মানুষকে প্রাণশক্তি দান করে। আর শুধু আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর আরো বহু জাতির মধ্যে এখনো সূর্য্যপূজা করিবার নিয়ম বর্ত্তমান। তাই আমার মনে হয় সমগ্র পৃথিবীতে না হউক বাংলাদেশের প্রতি ঘরে ঘরে রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি করিয়াই পূজা করা উচিত। প্রত্যেক বাঙ্গালীর প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া উপনিষদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত—'তমসো মা জ্যোতির্গময়' 'অসতো মা সদ্‌গময়'—তুমি আমাদের অন্ধকার হইতে জ্যোতির্ম্ময়লোকে লইয়া চলো, তুমি আমাদের অসত্য হইতে সত্যলোকে লইয়া চলো।

ভারতবর্ষ ও রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের লোকেরা যখন ভারতবর্ষকে একটা অসভ্য দেশ বলিয়া মনে করিত, যখন তাহারা ভাবিত শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সব তাহাদেরই একচেটিয়া—ভারতবর্ষ শুধু ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বন্যজন্তু ও বর্ব্বর জাতির বিচরণক্ষেত্র, তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে বুঝাইয়া দিলেন ভারতবর্ষের যাহা আছে তাহা জগতের আর কোন জাতির নাই—কি শিক্ষায়, কি জ্ঞানে, কি ধর্ম্মে ভারতবাসী নিকৃষ্ট ত নহেই, বরঞ্চ আজ যাহারা জগতের সভ্যতম মানুষ বলিয়া নিজেদের জাহির করিতেছে তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ।

প্রথমে একজন অসভ্য ভারতবাসীর মুখে এইকথা শুনিয়া তাহারা বিস্ময়ে সচকিত হইয়া উঠিল বটে কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই একে একে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করিতে বাধ্যই হইল। যিনি ভারতবাসীর কলঙ্ককালিমা অপনোদন করিয়া বাংলা তথা ভারতবর্ষকে আবার জগতের সম্মুখে রত্নসিংহাসনে বসাইলেন, তিনি বাংলার এই সুসন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! বাঙ্গালীজাতির সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীই এজন্য কৃতকৃতার্থ। বহু জন্মের তপস্যার ফলে তবে তাহারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছে। যতদিন ভারতবর্ষের অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন এই মহাকবির নাম কেহ ভুলিতে পারিবে না। বাহিরের জগতের কাছে আজ বাংলা ও ভারতবর্ষের পরিচয় শুধু রবীন্দ্রনাথ। তাই এদেশের কোন লোক যখন ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলে যাইয়া নিজেদের দেশ, জাতি ও ধর্ম্মের পরিচয় দেন তখন সেখানকার লোকেরা শুধু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করে, তুমি কি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক? আজ রবীন্দ্রনাথ বলিতে শুধু বাঙ্গালীজাতি বা বাংলা-দেশকে বুঝায় না, বুঝায় সমগ্র ভারতবর্ষকে—তাহার পঞ্চত্রিংশ কোটি অধিবাসীকে এবং তাহার শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা ও শত বৎসরের সংস্কৃতিকে। ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে মাটীতে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সঞ্চারিত, তাঁহারই সৃষ্টি আজ সহস্র রূপে আমাদের মধ্যে রূপায়িত; তাই আমাদের মস্তিষ্কে আজ তাঁহারই চিন্তা, আমাদের মুখে আজ তাঁহারই ভাষা, আমাদের প্রাণে আজ তাঁহারই বক্ষের স্পন্দন! প্রত্যেকটি ভারতবাসীর চিত্ত আজ তাঁহারই কল্পনায় অনুরঞ্জিত, তাঁহারই সঙ্গীতে অনুরণিত। তাই ভারতবর্ষ বলিতে আজ রবীন্দ্রনাথকে বুঝায়। তিনি সাগর, আমরা যেন ঢেউ। শুধু ভারতবর্ষ কেন সমগ্র এশিয়াখণ্ডের তিনি যেন অন্তরাত্মা।

পঁচিশে বৈশাখ পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সকল

দেশের পঞ্জিকাতে ঐ দিনটি লাল অক্ষরে চিরকাল রঞ্জিত হইয়া থাকিবে। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ঐ তারিখে বিশ্বজনপূজ্য রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন আমাদের দেশে। খৃষ্টের জন্মদিন, মহম্মদের জন্মদিন, বুদ্ধের জন্মদিনের কথা যদি কেহ কোনদিন ভুলিয়া না যায় ত ওই দিনটির কথা কখনো লোকের মন হইতে মুছিয়া যাইবে না। আজ হইতে আশি বৎসর পূর্ব্বে কে জানিত যে আমাদের এই বাংলাদেশে বাঙ্গালীর ঘরে এমন একজন সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন যাঁহার প্রতিভার জ্যোতি একদিন সারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে! কলিকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সূতিকাগৃহ শুধু বাঙ্গালীর নিকট নহে আজ সমগ্র জগদ্বাসীর নিকট পুণ্যতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে; বাংলাদেশের কোন সুবিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের এই বাড়িটি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া লিখিয়াছেন—

'জগৎ উজল যাঁর প্রতিভায়, এ সেই রবির উদয়গিরি!'

রবীন্দ্রনাথের জন্মকালকে ভারতের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে সর্ব্বত্র তখন একটা নব জাগরণের সূচনা; পুরাতন যা ছিল তাহার অবসান ও নতুনের অভ্যুদয়! রাজনৈতিক দিক হইতে তখন সিপাই বিদ্রোহের শেষ হয় ও ভারতের শাসনভার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে পার্লামেণ্টের হস্তে চলিয়া যায়। আবার এই সময় সুয়েজ খাল খোলার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ও ব্যবসায়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে ভারতে বিদেশীদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং দেশীয় শিল্প ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

বঙ্গসমাজের পক্ষেও এই সময়টিকে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে অত্যুক্তি

হয় না। কেননা সেই সময় বঙ্গদেশে এমন সব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রত্যেকটি বিষয় ইতিহাসে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত বাংলার সমাজে এক স্মরণীয় যুগ! দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা, হিন্দু সমাজের মধ্যে রক্ষণশীল দলের জাগরণ, ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বহু ঘটনা হইতে সমাজে একটা তুমুল আলোড়ন দেখা দেয়। ফলে বঙ্গ সাহিত্যে ইহাদের প্রভাব আসিয়া পড়ে। তদানীন্তন সাহিত্য তাই এইসব সমস্যায় সমাকীর্ণ। এইসব সাহিত্য পাঠ করিলে তখনকার বাঙ্গালীদের মনের ইতিহাস ভাল ভাবেই বুঝিতে পারা যায়।

বাংলাসাহিত্যে তখনো ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব আসিয়া পড়ে নাই বটে কিন্তু বিদেশীয় ভাবধারার সংঘাতে বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্য বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। বাংলা সাহিত্যের এই দুর্দ্দিনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা দুইজন প্রাণপণ যত্নে সাহিত্যের কৌলীন্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিলেও মধুসূদনের মহাকাব্যের বাহিরটা সম্পূর্ণ এদেশীয় ও অন্তর ছিল বিদেশী ভাবপূর্ণ। আর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ছাঁচে ভারতীয় সনাতন ভাবধারাকে এক অপূর্ব্ব রূপ দান করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ও ইউরোপীয় এই দুই বিপরীত ভাবের সমন্বয়ের যে সূত্রপাত তখন ইঁহাদের সাহিত্যে হইয়াছিল তাহারি মহত্তর বিকাশ হয় বিহারী-লালের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার পথে এই বিহারীলালই ছিলেন মন্ত্রগুরু।

ঠাকুরবংশ

রবীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহা ঠাকুর-পরিবার নামে বিখ্যাত। অর্থ যশ বিদ্যাবুদ্ধি কোন কিছুরই অভাব ছিল না সেখানে। তাঁহার পিতামহ ছিলেন বিরাট জমিদার। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত ব্যবসা করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং সেই অর্থে বিস্তর জমিদারী কিনিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা এইরূপ বিলাস-বৈভবের মধ্যে থাকিতেন যে লোকে তাঁহাকে 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' বলিয়া ডাকিত। তিনি তিনবার বিলাতে যান। বিলাতেই তাঁহার মৃত্যু হয় ইংরাজী ১৮৪৬ সনের ১লা আগস্ট। তখন তাঁহার বয়স একান্ন বৎসর।

দ্বারকানাথ যে কেবল ভোগ ও ব্যসন লইয়া দিন কাটাইতেন তাহা নহে। ঐশ্বর্য্য উপভোগের দিকে তাঁহার যেমন ঝোঁক ছিল আবার জনহিতকর কার্য্যেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। যখনই সমাজসংস্কারের ডাক আসিয়া তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে তখনই তিনি ছুটিয়া গিয়াছেন। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ, জমিদার সভা স্থাপন, ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে অল্পদিনে ডাক আনিবার ব্যবস্থা, সতীদাহ নিবারণ, ছাপাখানা প্রভৃতি স্থাপনের সময় তিনি অর্থ ও পরিশ্রম দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহাকেও অর্থ দিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত কোনদিন গ্রহণ করেন নাই। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন ব্রাহ্মণ। নিজের ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল গভীর। তাঁহার পরিবারের মধ্যেও সনাতন হিন্দুধর্ম্ম চিরকাল অটুট ছিল।

কিন্তু তাঁহার পুত্র, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম ইহার বিরোধিতা করেন। ক্রমশ তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের

প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিলেন যে বাংলা ১২৫০ অব্দের ৭ই পৌষ তিনি এই ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আজিও শান্তিনিকেতনে এই দিনটিকে পবিত্র বলিয়া গণ্য করা হয় এবং নানা আনন্দ-উৎসবে ইহার গৌরব বর্দ্ধন করা হয়। তারপর কেশব সেনের সহযোগিতায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারে একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন মহর্ষি বলা হয় তাহাও জানা প্রয়োজন। প্রিন্স দ্বারকানাথ মৃত্যুর সময় প্রায় এক কোটি টাকার ঋণ রাখিয়া যান। দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে তাহা ফাঁকি দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সমস্ত পাওনাদারদের ডাকিয়া তাহাদের সেই ঋণ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং যতদিন না ইহা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ হয় ততদিন জমিদারী হইতে তিনি একটি পয়সাও নিজের জন্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার এই মহানুভবতায় সকলে বিস্মিত হইয়া যায় এবং সেইদিন হইতে তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা দেয়; মহর্ষির বয়স তখন প্রায় বিয়াল্লিশ বৎসর।

দেবেন্দ্রনাথের সকল কার্য্যে কেশব সেন পুত্রের ন্যায় শিষ্যের ন্যায় সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন; মহর্ষিও অনেক আশা পোষণ করিতেন তাঁহার উপর। কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কিছুকাল পরে তাঁহাদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়, ফলে কেশব সেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে 'নববিধান ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন করিলেন। আর মহর্ষির ব্রাহ্ম সমাজ 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে অভিহিত হইল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যই ঋষিতুল্য ব্যক্তি। সৌম্য, শান্তমূর্ত্তি—তাঁহাকে দেখিলে মস্তক আপনি শ্রদ্ধায় অবনত হইত। তিনি দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল তিনি সন্ন্যাসীর মত নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ঈশ্বর-আরাধনায় কাটাইয়া

ছিলেন। নির্জ্জনে বাসের জন্য তিনি বোলপুরে যে জমি ক্রয় করিয়া 'শান্তিনিকেতন' স্থাপন করিয়াছিলেন ইহাই ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের সাধনাতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ছাতিম গাছের তলায় যেখানে বসিয়া মহর্ষি উপাসনা করিতেন আজিও সেই পবিত্র স্থানটি শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার অপাপবিদ্ধ জীবনের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন। তাই পিতার প্রিয় যাহা কিছু ছিল সবই তাঁহার নিকট অতি পবিত্র বলিয়া মনে হইত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন বহু সন্তানের পিতা। তাঁহার সর্ব্বসুদ্ধ পনেরোটি সন্তান হইয়াছিল; নয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চতুর্দ্দশ। পুত্রদের নাম যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পুণ্যেন্দ্রনাথ সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বুধেন্দ্রনাথ; এবং কন্যাদের নাম সৌদামিনী, সুকুমারী, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী। দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম একটি কন্যা জন্মে এবং অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়; পুত্রদের মধ্যে পুণ্যেন্দ্র ও বুধেন্দ্রের শিশুকালেই মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথেরা ছিলেন তিনভাই। তন্মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। গিরীন্দ্রনাথ মধ্যম ও নগেন্দ্রনাথ কনিষ্ঠ। নগেন্দ্রনাথের সন্তানাদি ছিল না। গিরীন্দ্রনাথের দুই পুত্র—গণেন্দ্র ও গুণেন্দ্র। গণেন্দ্র বিবাহের পূর্ব্বে মারা যান কিন্তু গুণেন্দ্র তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া যান—গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র, সুনয়নী ও বিনয়িনী।

এই ঠাকুর-পরিবার ছিল চিরকাল সর্ব্ববিষয়ে অগ্রণী। বাংলা দেশের সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মেকর্ম্মে যখন যে ঝড় বহিয়াছে তাহার প্রথম সূচনা হইয়াছে এই ঠাকুর-পরিবারে। অগ্রগতি বলিতে আজ যাহা কিছু বুঝায় সকলের মূলেই আছে এই পরিবারের নব নব সংস্কৃতির আদর্শ। অথচ সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রীতিনীতি ও মর্য্যাদা একদিন

সেখানে সর্ব্বদাই রক্ষিত হইত। রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশে প্রথম আই. সি. এস্। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি এবং হেমেন্দ্রনাথ কেশব সেনের সঙ্গে যোগদান করিয়া বাংলায় প্রথম নারীশিক্ষার আন্দোলন করেন। তাঁহাদেরই চেষ্টায় ১৮৬৬ সালে মহিলারা প্রথম ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতে পারেন। ইহাই বাংলাদেশে নারীপ্রগতির সূচনা।

সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম হিন্দুনারীদের অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরবাড়িতেই স্ত্রীলোকদের আব্রু সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিল। এবাড়ি হইতে ওবাড়ি যাইতে হইলে ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কীতে চাপিয়া দ্বারোয়ান সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাস্নানে যাইতেন তাঁহাদের পাল্কীসুদ্ধ গঙ্গায় ডুবাইয়া আনিবার রীতি ছিল।

স্ত্রীলোকদের যে পোষাক আজ সভ্য ও রুচিসঙ্গত বলিয়া বাংলাদেশের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে তাহাও এই ঠাকুরবাড়ির পরিকল্পিত। সত্যেন্দ্রনাথের পত্নী বোম্বাই অঞ্চলের পার্শী মহিলাদের পোষাক হইতে উহা এদেশে প্রবর্ত্তন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমাজের বহু সংস্কার সাধনে যত্নবান ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিশু তখন তাঁহার দাদাদের বেশ বয়স হইয়াছে। তাঁহারা অনেকেই যুবক, এবং সাহিত্য ও ললিতকলার দিকে প্রায় সকলেরই খুব ঝোঁক ছিল। সেইজন্য ঠাকুরবাড়িতে একটা সাহিত্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেখানে বহু সাহিত্যিক আসিতেন এবং সাহিত্য আলোচনা করিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং পিতৃব্যপুত্র গুণেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

নাটক অভিনয়ের দিকেও গুণেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

বাল্যকাল হইতে ঝোঁক ছিল। তাঁহাদের দুইজনের চেষ্টায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে একটি নাটকীয় দল গঠিত হয়। ইংরাজী থিয়েটারের অনুকরণে তখন বড়লোক ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের বাড়িতে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেন। ঠাকুর-বাড়িতে প্রথম মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'এ'কেই কি বলে সভ্যতা' এই নাটক দুইটির অভিনয় হয়। ইহা ছাড়া তৎকালীন আরো বহু বিখ্যাত নাটকের অভিনয় ঠাকুর-বাড়িতে এই নাট্যসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। রবান্দ্রনাথের তখন বয়স ছয় বৎসর।

সাহিত্য ও নাটকাভিনয় ছাড়া সঙ্গীতের চর্চ্চাও সেখানে নিয়মিত হইত। আদি ব্রাহ্মসমাজের গানের জন্য যে ওস্তাদ নিযুক্ত ছিলেন তাঁহার নিকট সকলে গানবাজনা শিক্ষা করিতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই সঙ্গীতবিজ্ঞানে ও যন্ত্রসঙ্গীতে এমন পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার সাধনায় মগ্ন ছিলেন।

এই সময় দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথ সকলেই গান রচনা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম বাংলায় গানের স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন। মোটকথা ঠাকুর-বাড়ি তখন দিনরাত সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকাভিনয় প্রভৃতিতে মুখরিত হইয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—'বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে স্বাদেশিকতায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের মনে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল'।

রবীন্দ্রনাথের তখন অল্প বয়স। তিনি ও তাঁহার সমবয়সী অপর বালকেরা এইসবের রসগ্রহণ করিতে পারিতেন না বটে কিন্তু দূর হইতে এইসব আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আবেগে তাঁহাদের শিশু-চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

সংস্কৃতির যে ধারা ঠাকুর-বাড়িতে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে তাহা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে বলিলে বোধ করি ঠাকুরবংশের অগৌরব ঘোষণা করা হইবে, কারণ সেদিন যাহা ছিল অঙ্কুর আজ তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলে ফুলে পল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলেও এই ঠাকুরবাড়িতে এমন আরো কয়েকজন শিল্পী জন্মিয়াছেন যাঁহাদের এক একজনকে এক একটি দিক্‌পাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নাম করিতে হয় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ইনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। চিত্রশিল্পী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আজ সারা পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমাদের দেশের লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছেন এই অবনীন্দ্রনাথ। তাঁহার অঙ্কিত বহু ছবি বিলাতে রাজমাতা কুইন মেরীর প্রাসাদকক্ষে সাজানো আছে, এবং লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দ্য ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্জেলোর ছবির সঙ্গে আজও সমান গৌরবে শোভা পাইতেছে ইঁহার ছবি।

ইহা ছাড়া অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও চিত্র-জগতে এক নতুন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের নিকট হইতে অজস্র সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই চিত্ররূপের নাম 'কিউবিসম্'। আলো-ছায়ার যে অদ্ভুত খেলা তিনি সাদার উপর শুধু কালো রঙে দেখাইয়াছেন তাহা চিত্রজগতের বিস্ময়!

আর যাঁহার নাম এখানে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তিনি হইলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের ভাণ্ডারী। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান ছিল; তাহা ছাড়া তিনি নিজে অতি সুগায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান যে আজ সাদরে ও সগৌরবে বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইতেছে তাহার জন্য দিনেন্দ্রনাথের কাছে সমগ্র বাঙ্গালীজাতি চিরকৃতজ্ঞ। ইনি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র।

তাহাছাড়া সাহিত্যক্ষেত্রে ঠাকুর পরিবারের আরো তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী—তিনি বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক বলিয়া প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন; আর একজন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলাসাহিত্যে, রেখাচিত্রে ও সঙ্গীতে তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই গ্রন্থাবলী আজও সকলের নিকট আদরের বস্তু। কিন্তু সর্ব্বশেষে বলিলেও সবচেয়ে ক্ষমতাশালী লেখনী ছিল বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র। বলেন্দ্রনাথ অল্প বয়সে মারা যান। তাঁহার গদ্য রচনা কবিতার মত মধুর ও সুন্দর ছিল। অল্প বয়সে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী পাঠ না করিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল রত্নবিশেষ। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীর ইহা অবশ্যপাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহাই তাহার গৌরবময় সংক্ষিপ্ত পরিচয়। ইহা ছাড়াও আরো বহু উজ্জ্বল রত্ন এই বংশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন যাহার জন্য বাংলাদেশ এই ঠাকুর-পরিবারের কাছে চির-ঋণী।

ছেলেবেলা

এইবার আমরা রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ফিরিয়া যাইব। আশি বৎসর পূর্ব্বে ঠাকুর-পরিবার যে এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল ইহা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছেলেবেলা সম্বন্ধে নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত।

শহরের বাইরে শহরতলীর মত, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে কলরবে আকাশটাকে আঁট করে বাঁধেনি। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্ব্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার অনুশাসন ক্রিয়াকর্ম্ম সেখানে সমস্তই বিরল। আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি, তার ছিল গোটা কতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচেপড়া তলোয়ার-খাটানো দেউড়ি, ঠাকুরদালান, তিন চারটে উঠোন ও সদর অন্দরের বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ধরে রাখবার মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্ব্বযুগের নানা পালা-পার্ব্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজে-সজ্জায় তার মধ্যে দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল। আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি। আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েচে, নতুনকাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয়নি।

এবাড়ি থেকে এদেশীয় সামাজিক স্রোত যেমন সরে গেছে, তেমনি পূর্ব্বতন ধনের স্রোতেও পড়েছে ভাঁটা। পিতামহের ঐশ্বর্য্য-দীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান ছিল। সেদিন বাকি ছিল দহনশেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই, আর একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণ সমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের আমোদ-প্রমোদ-বিলাস-সমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদিবা থাকে তাদের কোন অর্থ নেই। আমি ধনের মধ্যেও জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও নয়।

এই নিরালায় এই পরিবারের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক। তাই আমাদের ভাষায় একটা কিছু ভঙ্গী ছিল কলকাতার লোকে যাকে ইসারা ক'রে বলতো ঠাকুরবাড়ির ভাষা। পুরুষ ও মেয়েদের বেশভূষাতেও তাই, চালচলনেও।

বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন, সদরে ব্যবহার হ'ত ইংরেজী—চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন কি মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারেনি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।

আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্‌পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে সাধারণত বাংলা দেশে ধর্ম্মসাধনায় যে উদ্বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্ত্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।

এই যেমন একদিকে, তেমনি অন্যদিকে আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যের আনন্দ ছিল নিবিড়।"

এককথায় তখনকার ঠাকুরবাড়ি ছিল ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ত্রিবেণী-সঙ্গম, আর তাহারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল কাটে। তাই বিদেশী ভাষার প্রতি যেমন তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছিল দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার প্রতি তেমনি শ্রদ্ধাও ছিল সুগভীর। বিদেশী শিক্ষার নূতন স্রোতে তিনি ভাসিয়া যান নাই আবার প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতের মোহ তাঁহাকে পশ্চাতের দিকে টানিয়া রাখে নাই। প্রাচীনের গাম্ভীর্য্য ও নবীনের চঞ্চলতা সমানভাবে তাঁহার সুসঙ্গত জীবনধারাকে বিকাশের পথে সহায়তা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মন বাল্যকাল হইতে দেশী ও বিদেশী এই উভয় শিক্ষার রসগ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উপনিষদের প্রভাব ফল্গুর মত তাঁহার মনের স্তরে স্তরে এমনভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল যে রবীন্দ্রনাথের

জীবনের ছোট বড় প্রতি কাজে তাহাই ফুলের গন্ধের মত আপনি প্রকাশ পাইত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যে সংযম যে সৌন্দর্য্য তাহা যে বাল্যকাল হইতে এই উপনিষদ শিক্ষার ফল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁহার শিশুজীবনে কাব্যের প্রথম প্রভাব সম্বন্ধে যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা চমৎকার। তিনি বলিয়াছেন, বিস্মৃতির কুহেলী ভেদ করিয়া প্রথম যে কথাটি তাঁহার স্মরণে জাগে তাহা হইল—"জল পড়ে, পাতা নড়ে"।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগের এই লাইনটি তাঁহার জীবনে আদি কবির প্রথম কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তখন সবে অ আ ক খ শেষ করিয়াছেন ; এই লাইনটির মধ্যে যে কী ছিল তাহা বুঝিবার মত বোধশক্তি তখন তাঁহার হয় নাই, তবুও সমস্তদিন ধরিয়া এই কয়টি কথা ঝঙ্কার তুলিয়া তাঁহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল।

যেদিন এই লাইনটি কবির মুখ হইতে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল সেদিন ভারতের সুপ্রভাত! বাঙ্গালীর জীবনে এক স্মরণীয় দিন! "'মা-নিষাদ···" এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিয়া বাল্মীকি যেমন মহাকবি হইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি শৈশবে এই লাইনটি আবৃত্তি করিয়া একদিন বিশ্বকবি হইয়াছিলেন।

বাড়িতে একই গুরুমহাশয়ের কাছে তাঁহারা তিনজন লেখাপড়া শিখিতেন—রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার ভ্রাতা সোমেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ইঁহারা দুইজনেই বয়সে কিছু বড়, কিন্তু তিনজনে একত্রে একই ভাবে মানুষ হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে দুইজনকে স্কুলে যাইতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ কান্না জুড়িয়া দিতেন। ইহাতে বিরক্ত হইয়া একদিন তাঁহার শিক্ষকমহাশয় রবীন্দ্রনাথের পিঠে একটি চড় বসাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "এখন যেমন স্কুলে যাবার জন্য

কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য একদিন ইহার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদিতে হইবে।”

সেদিন এই শিশুটির মন তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন এমন বোধ হয় আর কেহ পারেন নাই। তাই তাঁহার মুখের এই কথা একদিন ভবিষ্যদ্বাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের জীবনে দেখা দিল। কান্নার জোরে তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হইলেন বটে কিন্তু বেশিদিন সেই স্কুলটি তাঁহার ভাল লাগিল না; তিনি সে স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেখান হইতে তাঁহাকে নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। এখানেও তাঁহার মন টিঁকিত না। পড়া না পারিলে মাস্টার মহাশয় ছাত্রদের বেঞ্চির উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া হাতে বই শ্লেট চাপাইয়া দিতেন। তাই শিক্ষকদের দেখিলেই তাঁহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইত। তাহা ছাড়া সহপাঠীদের সঙ্গেও তিনি ভাল করিয়া মিশিতে পারিতেন না। তাহাদের খেলাধূলা আচারব্যবহার ও আমোদপ্রমোদের সঙ্গে তাঁহার রুচির মিল হইত না। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হইত, বাড়ি যাইতে পারিলে বাঁচি। তখন তাঁহার বয়স বড়জোর ছয় কি সাত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্কুল-জীবনে এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তাঁহাদের ক্লাশের বাৎসরিক পরীক্ষার বাংলা খাতা মধুসূদন বাচস্পতি দেখিয়াছিলেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হইয়াছে, তিনি এত নম্বর পাইবার উপযুক্ত নন। তাঁহার ক্লাশের শিক্ষকমহাশয়েরাও সকলে ইহা সমর্থন করিয়া বলিলেন, অন্তত ক্লাশে রবীন্দ্রনাথের এরূপ প্রতিভার কোন পরিচয় তাঁহারা কোনদিন পান নাই। তখন কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এবারও রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিলেন।

বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় ঘটে ভৃত্যদের সাহায্যে। কথাটা শুনিতে কানে খারাপ লাগে বটে কিন্তু সত্যই তাই। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার ছিল বাড়ির ভৃত্যদের উপর। তাহারাই তাঁহাকে খাওয়াইত পরাইত, সঙ্গে করিয়া স্কুলে লইয়া যাইত, ভালবাসিত আবার শাসনও করিত। ভৃত্যদের কত হৃদয়হীন ব্যবহার যে তিনি অম্লানবদনে সহ্য করিতেন তাহার অন্ত নাই।

তাঁহার মাতার তখন স্বাস্থ্য ছিল খারাপ এবং বাড়ির অন্যান্য রমণীরাও নিজ নিজ সংসারের ভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহাদের স্নেহসঙ্গ লাভে তিনি বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর তাঁহার পিতৃদেবও এই সময় বাড়িতে থাকিতেন না, দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়া কাটাইতেন। কদাচিৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত। কাজেই ভৃত্যেরাই ছিল একরকম তাঁহার অভিভাবক। তাহাদের শাসনে রবীন্দ্রনাথের এক পা বাড়ির বাহিরে দিবার উপায় ছিল না। আবার কখনো কখনো ঘরের মধ্যে খড়ি দিয়া গণ্ডী কাটিয়া দিয়া ভৃত্যেরা তাঁহাকে বাহিরে পা দিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথ বন্দিনী সীতার মত সেই ভৃত্যমহলে একাকী বসিয়া থাকিতেন।

এই সময় ভৃত্যদের পড়িবার বই রামায়ণ, মহাভারত, চাণক্যশ্লোক প্রভৃতি তাঁহার প্রথম হাতে আসে। তিনি লুকাইয়া লুকাইয়া বইগুলি পাঠ করিতেন। আশ্চর্য্য, ফার্স্ট বুক দেখিয়া যখন তাঁহার চোখে জল আসিত তখন রামায়ণ পড়িয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। এইভাবে তাঁহার সাহিত্যের প্রতি প্রথম অনুরাগ জন্মায়।

আবার সেইখানে সেই রুদ্ধ ঘরে তিনি বন্দী হইয়া থাকিলেও তাঁহার মনকে কেহ কখনো বাঁধিতে পারে নাই, উন্মুক্ত বাতায়নপথ

দিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইত—যেখানে প্রকৃতি উদার, যেখানে আকাশ সুনীল, যেখানে রৌদ্রঝলমল তরুশ্রেণী, যেখানে পুষ্করিণী, ফুল, লতাপাতা। ইহা ছাড়া তাঁহার সঙ্কীর্ণ পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে একটুকরো অনাবৃত ছাদ ছিল, সেইখানে বসিয়া তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় দূরে চাহিয়া থাকিতেন। বাড়ির ছাদ, গাছের মাথা, সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, মধ্যাহ্নে চিলের ডাক সমস্তই যেন এক অমোঘ বলে তাঁহার মনকে অহরহ আকর্ষণ করিত। ইহাতে তিনি এক নিগূঢ় নিবিড় আনন্দ লাভ করিতেন—বাহিরের চিরসৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি তাঁহার রুদ্ধ জীবনের সমস্ত অবসাদ ঘুচাইয়া দিয়া খেলার সাথীর মত সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার প্রতিটি মুহূর্ত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত—রঙে, রসে, গানে, প্রেমে। তাই বাল্যের এই লীলাসঙ্গিনীটির কথা তিনি কখনো বিস্মৃত হন নাই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিল অচ্ছেদ্য। তাহারই সুখে তিনি সুখ লাভ করিয়াছেন, আবার তাহারই দুঃখে দুঃখ পাইয়াছেন। তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও তিনি কখনো যথার্থ আপন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই।

অনেকের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে দারুণ ভোগবিলাসের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন—কিন্তু ইহা একেবারেই সত্য নহে। কেননা তাঁহার পিতা ছিলেন অত্যন্ত সংযমী ও সাত্বিক প্রকৃতির। জীবনের কোন ক্ষেত্রে তিনি বাহুল্য পছন্দ করিতেন না। আহারে-বিহারে বেশভূষায় রীতিনীতিতে তাই কাহারও কোন বড়মানুষিপনা ছিল না। ধনী ও বনেদী বংশের সন্তান হইয়াও অতি দরিদ্রের মত তাঁহারা বাস করিতেন। বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছদ পরেন নাই। এমন কি শীতকালেও একটা সাদা জামা গায়ে দিয়া এবং একজোড়া চটি জুতা পায়ে দিয়া দিন কাটাইয়াছেন। খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধেও তাঁহার কোন বাছবিচার ছিল না। ভৃত্যেরা

যখন যাহা আনিয়া দিত তাহাই সানন্দে গ্রহণ করিতেন। যে ঘরে বসিয়া তিনি লেখাপড়া করিতেন সেখানেও কোন আসবাবপত্র ছিল না। মেঝের উপর একখানা ময়লা মাদুর পাতিয়া ও কাচের সেজে রেড়ির তেলের মিটমিটে আলো জ্বালিয়া বালক রবীন্দ্রনাথ লেখাপড়া করিতেন।

তাঁহার বয়স যখন সাত কি আট হইবে তখন একদিন তাঁহার এক ভাগিনেয় রবীন্দ্রনাথকে চুপি চুপি একটি ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কিভাবে চৌদ্দ অক্ষর মিলাইয়া পদ্য লিখিতে হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে অনেক বড় এবং সবে শেক্‌স্‌পীয়ার পড়িতে শুরু করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ অক্ষর মিলাইয়া হঠাৎ একদিন এক কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন। ইহাই হইল জগতের শ্রেষ্ঠ কবির কবি-প্রতিভার প্রথম বিকাশ!

নিজে চেষ্টা করিলে যে পদ্য রচনা করা যায় ইহা কোনদিন তিনি কল্পনাও করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু প্রথম ভয় যখন ভাখিয়া গেল তখন তাঁহার উৎসাহ দেখে কে! অনেক কষ্টে একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিয়া তাহাতে পেন্সিলের লাইন টানিয়া তিনি অসমান বড় বড় অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার এই নবস্ফূর্ত্ত প্রতিভার উৎপাতে তখন বাড়ির লোকেদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আর এই বিষয়ে তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে উৎসাহী। ছোট ভাইয়ের এই সকল রচনায় তিনি নিজে এত গর্ব্ব অনুভব করিতেন যে যাহাকে সামনে পাইতেন তাহাকে ডাকিয়া সেই পদ্য পড়িয়া শুনাইতেন।

একদিন 'ন্যাশনাল পেপার' পত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয় কি একটা কার্য্য উপলক্ষে তাঁহাদের বাড়িতে আসেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন রবীন্দ্রনাথের

একটি কবিতা শুনিবার জন্য। কবির জামার পকেটে পকেটে তখন সর্ব্বদা সেই নীলখাতাখানি ঘুরিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটি কবিতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়া দিলেন। নবগোপালবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে। শুধু একটি কথাকে তিনি পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে বিশ্বাস ছিল যে সেই কথাটিই কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হইয়াছে, তাই তিনি সেটিকে বদল না করিয়া যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিলেন। ইহাই হইল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির কবিতার প্রথম সমালোচনা !

সেই সময় নর্ম্মাল স্কুলের একজন শিক্ষক কবিকে বাড়িতে পড়াইতেন। তাঁহার কাছে প্রত্যহ সকাল ছয়টা হইতে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রাণিবৃত্তান্ত হইতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য পর্য্যন্ত পড়িতে হইত। স্কুলের পড়া ছাড়া বাড়িতে আরো অনেক বেশি পড়িবার ব্যবস্থা তাঁহার সেজদাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু যে তিনি কবিতা লেখায় রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিতেন তাহা নহে, সর্ব্ববিষয়ে যাহাতে তিনি সুশিক্ষিত হইয়া উঠেন সেদিকে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন।

এতটুকু বালকের প্রতিদিনের কর্ম্মপদ্ধতি শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যূষে উঠিয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথকে এক কাণা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়িতে হইত। তারপর মাটিমাখা দেহের উপর একটা জামা চাপাইয়া গৃহশিক্ষকের নিকট পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদ-বধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক পড়িতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিবার পর বিকালে তাঁহার ড্রয়িং ও জিম্ন্যাস্টিকের শিক্ষক আসিতেন। ইহার পর সন্ধ্যার সময় আর একজন শিক্ষক আসিয়া তাঁহাকে ইংরাজী পড়াইয়া যাইতেন। প্রত্যহ

রাত্রি নয়টার পর তিনি ছুটি পাইতেন। ইহার উপর রবিবার সকালে তাঁহাকে গান শিখিতে হইত ওস্তাদের কাছে। সকল দিনের মধ্যে এই দিনটি রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দের বলিয়া মনে হইত, কেননা গানের মধ্য দিয়া তিনি যেন প্রাণে একটা নব প্রেরণা লাভ করিতেন। তাই যদি কোনদিন কোন কারণে এই ওস্তাদ কামাই করিত তাহা হইলে তাঁহার মন বড় খারাপ হইয়া যাইত।

মধ্যে মধ্যে আরো একজন শিক্ষক আসিয়া যন্ত্রপাতি সহযোগে তাঁহাকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই বিষয়টিও কবির বেশ ভাল লাগিত। চোখের সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ঘটিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময় অনুভব করিতেন। ইহা ছাড়া মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রের কাছে রবীন্দ্রনাথকে অস্থিবিদ্যা শিখিতে হইত। ইহারই মধ্যে মধ্যে আবার এক তত্ত্বরত্ন মহাশয় আসিয়া কবিকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সংস্কৃত সূত্র মুখস্থ করাইয়া যাইতেন।

মোটকথা জগতে শিক্ষণীয় বিষয় যাহা কিছু আছে তাহা হইতে যাহাতে রবীন্দ্রনাথ বাদ না পড়েন বাল্যকাল হইতে তাঁহার সেজদাদা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাংলাভাষায় অনেকদূর অগ্রসর হইবার পর তবে তিনি ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন, "যখন চারিদিকে খুব ঘটা করিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তখন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজোদাদার উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।"

এইসব শিক্ষকদের মধ্যে একজনের নাম ছিল অঘোরবাবু। তিনি ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁহাকে কবি সবচেয়ে ভয় করিতেন। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কোনদিনই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিস্মৃত হইতেন না,

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে তাঁহাকে পড়াইতে আসিতেন। এমন কি দারুণ বৃষ্টিতে রাস্তায় যখন গাড়িঘোড়া বন্ধ, এবং মনুষ্য-চলাচলও একরকম অসম্ভব হইয়া উঠিত, তখনও তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্মে ক্রটি হইত না, গলির মোড়ে তাঁহার ছাতাটি ঠিক দেখা যাইত।

ইহারই ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চ্চা চলিত। ক্রমে এই সংবাদটি তাঁহার স্কুলে ছড়াইয়া পড়িল। তখন নর্ম্মাল স্কুলের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন গোবিন্দবাবু। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বেঁটে মোটা-সোটা মানুষটি—কালো চাপকান পরিয়া স্কুলে আসিতেন। তাঁহাকে দেখিলেই রবীন্দ্রনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। একদিন ছুটির পর তিনি হঠাৎ কবিকে তাঁহার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সভয়ে উপস্থিত হইতেই তাঁহাকে তিনি একটি কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। বলা বাহুল্য পরদিন যখন তিনি কবিতা লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন, তিনি কবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ছাত্রবৃত্তি ক্লাশের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন এবং তাহাদের সেইটি পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। কবিতাটি শুনিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের তখন কেমন লাগিয়াছিল জানি না তবে অধিকাংশ ছাত্র বলাবলি করিয়াছিল যে উহা রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা নহে অন্যের ছাপা কবিতা তিনি নকল করিয়াছেন। এমন কি একজন ছাত্র এমন কথাও বলিয়াছিল যে কবি যে-বই হইতে উহা নকল করিয়াছেন তাহা তাহার কাছে আছে। হায়, সেদিন যদি তাহারা জানিতে পারিত যে একদিন তাহাদের স্কুলের এই ছাত্রটি জগতের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করিবে তাহা হইলে কেহ তাঁহাকে এই অপবাদ দিতে সাহস করিত না।

যাহা হউক নর্ম্মাল স্কুলের পাঠ শেষ হইবার পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথ উহা ছাড়িয়া দেন এবং বেঙ্গল একাডেমী নামক এক ফিরিঙ্গী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। তাঁহার বাংলা শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে এইবার ইংরাজী

শুরু করা উচিত ইহা তাঁহার অভিভাবকরা মনে করিলেন। কিন্তু ঐ স্কুলের পড়াশুনা রবীন্দ্রনাথের আদৌ ভাল লাগিত না। সেখানকার অধ্যক্ষও ছেলেদের বিশেষ যত্ন লইতেন না; নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিলেই তিনি খুশি হইতেন। তাহার উপর ল্যাটিন ব্যাকরণটা তাঁহার অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইত তাই নানা ছুতা করিয়া তিনি বাড়ি চলিয়া আসিতেন। তাঁহার ভ্রাতা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশও তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। তাঁহারা তিন জনে একই সঙ্গে নর্ম্মালস্কুল ছাড়িয়া দিয়া সেখানে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

সেখানকার ছাত্রদেরও রবীন্দ্রনাথ আদৌ সহ্য করিতে পরিতেন না। তাহারা অধিকাংশই ফিরিঙ্গী, এবং নানারকম অভদ্র আচরণ করিত বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। শুধু একজন বাঙ্গালী ছাত্রের প্রতি কবি কয়েকদিন খুব অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই ছাত্রটির একটি ম্যাজিকের বই ছিল। তাহাতে তাহার ছাপা নামের সঙ্গে প্রফেসর উপাধি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এমন কোন ছাত্রকে তিনি দেখেন নাই যাহার বই ছাপা হইয়াছে। তাই সহপাঠী সেই গ্রন্থকার-বন্ধুকে স্কুলে আসিবার সময় প্রত্যহ তিনি তাঁহাদের গাড়িতে করিয়া লইয়া আসিতেন।

এইভাবে সেই ছেলেটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং সে তাঁহাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে। রবীন্দ্রনাথের তখন ম্যাজিক শিখিবার খুব সখ হয়; তিনি সেই বন্ধুর নিকট হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত দুই একটি বিষয় শুনিয়া তাহা পরীক্ষা করিতেন কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা এবং ভাগিনেয়েরও উৎসাহ ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু পুস্তকে বর্ণিত ম্যাজিকগুলি সব যখন পরীক্ষার দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হইল তখন সেই গ্রন্থকার-বন্ধুটি লজ্জায় আর তাঁহাদের কাছে

মুখ দেখাইতে পারিল না, তাঁহাদের বাড়িতে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিল।

এই ছেলেটির নাটক-অভিনয়ের দিকে খুব ঝোঁক ছিল। একবার তাহারই পরামর্শে গোটাকতক বাঁখারির উপর নানারঙের কাগজ জড়াইয়া তাঁহারা কুস্তির আখড়ার মাটির উপর এক স্টেজ খাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিভাবকদের নিষেধে সেখানে অভিনয় করা সম্ভব হয় নাই। বিনা স্টেজে শুধু ভ্রান্তিবিলাস নামক একটি প্রহসন একদিন তাঁহারা অভিনয় করেন। এই প্রহসনটি রচনা করিয়াছিলেন সত্যপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই বোধ হয় প্রথম অভিনয়!

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর ছিল অতি মধুর। শ্রীকণ্ঠ সিংহ নামক এক ভদ্রলোক তখন তাঁহাদের বাড়িতে প্রায়ই আসা-যাওয়া করিতেন। তিনি তাঁহার পিতৃবন্ধু ছিলেন। অতি অমায়িক প্রকৃতির প্রাণখোলা লোক। ছোটবড় সবাই ছিল তাঁহার বন্ধু। দিনরাত তাঁহার কণ্ঠে গান লাগিয়া থাকিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার প্রিয় শিষ্য। তিনি একটি গান সবচেয়ে ভালবাসিতেন, তাহার প্রথম লাইন হইল "ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী"। এই গানটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া বাড়ির ঘরে ঘরে সকলকে শুনাইয়া বেড়াইতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি রবীন্দ্রনাথ যখন বালক তখন তাঁহার পিতা দেশ-ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তাঁহার কাছে পিতা একরকম অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয়। হঠাৎ হয়ত কখনো বাড়ি ফিরিতেন আবার দুই-চারি দিন থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। তবে তিনি আসিলেই বাড়ির আবহাওয়া যেন অন্যরকম হইয়া যাইত। সবাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিত; কাহারো মুখে পান থাকিলে তাহা ফেলিয়া দিয়া মুখ ধুইয়া আসিত। বাড়ির ছোটবড় সকলের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা

সংযমের ভাব দেখা দিত। পাছে গোলমাল করিলে তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে সেইজন্য সবাইকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত। তিনি বাড়ি থাকিলে বাড়ির লোকজনেরা সব ধীরে ধীরে চলাফেরা করিত, অনুচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা কহিত। ছেলেমেয়েরা তাঁহার ঘরে উঁকি মারিতে পর্য্যন্ত সাহস করিত না।

এইভাবে হঠাৎ একবার মহর্ষি বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের একসঙ্গে তিনজনের উপনয়ন দিয়া দিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে উপনয়ন-প্রথা আছে, কিন্তু এবার এ অনুষ্ঠান হইল খাঁটি বৈদিক প্রথায়। রবীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদ মুণ্ডিত মস্তকে ব্রহ্মচারী হইলেন।

নতুন ব্রাহ্মণ হইবার পর রবীন্দ্রনাথের মনে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল। গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ করিবার সময় তাঁহার অন্তর যেন কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তখন কবির যে বয়স তাহাতে এই সংস্কৃত মন্ত্রের সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করিবার কথা নহে তথাপি তাহার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে তিনি যেন কোন্ অদৃশ্যলোকে চলিয়া যাইতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনীতে নিজে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের পড়িবার ঘরে শানের মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দুই চক্ষু ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল; জল কেন পড়িতেছে তাহা তিনি নিজে কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথ মহা দুশ্চিন্তায় পড়িলেন, নেড়ামাথা লইয়া কেমন করিয়া ফিরিঙ্গী স্কুলে যাইবেন, সহপাঠীরা হয়ত কত বিদ্রূপ করিবে! এইসব লইয়া যখন তিনি মনে মনে তোলাপাড়া করিতেছেন এমন সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে তিনি রাজী আছেন কিনা। রাজী!—রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া সেই কথাটি সকলকে জানাইয়া দেন। ইহাই তাঁহার জীবনে প্রথম বাহিরে যাইবার সুযোগ।

তখন কবির বয়স মাত্র এগারো বৎসর। সেই সময় প্রথম তাঁহার জন্য কতকগুলি ভাল ভাল পোষাক তৈরী হইল। ইহার পূর্ব্বে কোনদিন রবীন্দ্রনাথ জরির টুপি বা মখমলের জামা গায়ে দেন নাই।

হিমালয়ে যাইবার পূর্ব্বে কবিকে লইয়া তাঁহার পিতা প্রথমে কয়েকদিনের জন্য বোলপুর শান্তিনিকেতনে গিয়া ছিলেন। সেখানে তখন একখানি মাত্র একতালা ঘর ছিল। ট্রেনে উঠিয়া পথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের মন আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ট্রেনেও তিনি এই প্রথম চাপিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তর, গাছপালাঘেরা ছোট ছোট গ্রাম, দূরে তরুশ্রেণীর শ্যামলরেখা—সমস্তই তিনি প্রথম দেখিলেন।

তারপর বোলপুরে গিয়া দেখিলেন আর এক দৃশ্য। মরুভূমির মত ঢেউ খেলানো দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর, আর তাহার মধ্যে ছোট ছোট খোয়াই। বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষইয়া গিয়া যে কাঁকরের ঢিপিওয়ালা খদের স্থষ্টি হয় তাহাকে বীরভূমে খোয়াই বলে। রবীন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাথর সংগ্রহ করিতেন, কখনো বা খোয়াইয়ের মধ্যে যেখানে ঝির ঝির করিয়া জল পড়িত তাহা সোৎসাহে আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতেন। মহর্ষি পুত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। বরং তাঁহার মনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্ববিষয়ে তিনি উৎসাহ দান করিতেন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত দূরে কোন খোয়াইয়ের মধ্যে জল দেখিয়া আসিয়া পিতার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন সেখানকার জল খাইবার জন্য কিংবা তাহাতে স্নান করিবার জন্য, তখনি তিনি তাহা আনাইবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাকে কোন বিষয়েই নিরুৎসাহ করিতেন না। তাহাছাড়া বাল্যকাল হইতে যাহাতে তাঁহার মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান জন্মায়, যাহাতে দয়াধর্ম্ম প্রভৃতি স্থকোমল মানসিক বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেদিকে তিনি সর্ব্বদা নজর রাখিতেন।

মহর্ষি সর্ব্বদা কয়েক আনা পয়সা রবীন্দ্রনাথের কাছে রাখিয়া দিতেন এবং তাহার যথাযথ হিসাব রাখিতে বলিতেন। কোন ভিখারী দেখিলে তিনি উহা হইতে তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে আদেশ দিতেন। ইহাছাড়া তাঁহার অতি মূল্যবান সোনার ঘড়িতে দম দিবার ভার ছিল তাঁহার উপর। বলা বাহুল্য, হিসাব যেমন একবারও মিলিত না, ঘড়িও তেমনি বহুবার মেরামত করিতে হইত। কলিকাতার বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অতি নগণ্য কিন্তু এখানে পিতার নিকট হইতে এইরকম গুরুতর কাজের ভার পাইয়া মনে মনে তিনি অত্যন্ত গৌরব অনুভব করিতেন।

কোন কোন দিন কবি বাগানে যাইয়া একটি শিশু-নারিকেল গাছের তলায় কাঁকরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামক কবিতাটি তিনি সেখানে লিখিয়াছিলেন। তাহার অস্তিত্ব বালকের ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত কবে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বোলপুর হইতে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম লইয়া তাঁহারা পিতাপুত্রে অমৃতসহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা মাসখানেক ছিলেন। এই সময় শিখদের মন্দিরে গিয়া মহর্ষি ভজন গান শুনিতেন এবং তাহাদের প্রার্থনায় যোগদান করিতেন। আবার কোন কোন দিন রাত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখে ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া নতমস্তকে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে মহর্ষি বড় ভালবাসিতেন। একবার কবি কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়া পিতৃদেবকে শুনাইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে, গান থামিবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাতে একটি পাঁচশত টাকার চেক উপহার দিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেশের রাজা যদি দেশের ভাষা জানিত এবং সাহি[illegible]র কদর বুঝিত তবে কবিকে পুরস্কৃত করিত; যখন
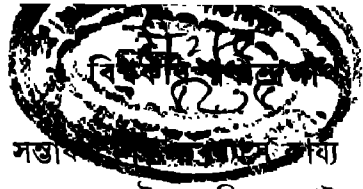
রাজার কাছ হইতে তাহা পাইবার কোন সম্ভা[illegible] কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে।’ তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তাই সাহিত্যের জন্য সেদিন যাঁহাকে তিনি পুরস্কার দিয়াছিলেন একদিন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তিনি লাভ করিয়াছিলেন। যখনকার কথা বলিতেছি ইহা অবশ্য তাহার বহুদিন পরে ঘটিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যে গানগুলি তখন রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের একটি হইতেছে—

‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।…’

অমৃতসহর হইতে তাঁহারা ডালহৌসী যাত্রা করিলেন। ঝাঁপানে করিয়া তাঁহারা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। কত উপত্যকা-অধিত্যকা কত সুন্দর বন-উপবনের মধ্যদিয়া তাঁহাদের ঝাঁপান চলিল। পথে ডাকবাংলায় আহার করেন ও রাত্রি কাটান। এইভাবে তাঁহারা বক্রোটায় পৌঁছিলেন। সেখানে তাঁহাদের বাসা ছিল একটি পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে। যদিও গ্রীষ্মকাল তবুও শীতের প্রাবল্য অত্যধিক। এমন কি যেসব স্থানে দিনের বেলা রৌদ্র পড়ে না তখনো সেখানে বরফ জমিয়া ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ একাকী একটা লাঠি হাতে করিয়া সেই পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার জন্য মহর্ষি একটুও উদ্বিগ্ন হইতেন না। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া যখন উপাসনায় বসিতেন তখন পুত্রের ঘুম ভাঙাইয়া দিতেন, রবীন্দ্রনাথকে উঠিয়া সে সময় ব্যাকরণকৌমুদী মুখস্থ করিতে হইত।

তারপর প্রভাতে বেড়াইয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক ইংরাজী পড়া চলিত। পিটার পালির গল্পগুলি মহর্ষি কবিকে পড়াইতেন। রাত্রে তিনি আকাশের তারা দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখাইতেন। ইহা ছাড়া ঐ বিষয়ের ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনেক কথা তিনি মুখে মুখে বুঝাইয়া দিতেন, এবং কবিকে তাহা বাংলায় লিখিতে হইত। ইহাই তাঁহার গদ্যরচনার সূত্রপাত!

এইভাবে ভ্রমণ করিবার পর প্রায় চার মাস বাদে রবীন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের পর স্কুল খুলিলে আবার তিনি তাঁহার পুরাতন ক্লাশে গিয়া বসিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার আর কিছুতেই সেখানে মন বসিল না। এতদিন উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে কাটাইয়া আসিয়া কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন চারিপাশের দেওয়াল তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। সেখানে কোন সৌন্দর্য্য নাই—হাসপাতাল কিংবা জেলখানার মতই সে নির্ম্মম। সেখানে তাঁহার মন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। নানা ছলে রবীন্দ্রনাথ তখন স্কুল হইতে পলাইতে শুরু করিলেন। এমনি করিয়া একদিন বেঙ্গল একাডেমীরও পড়া তাঁহার শেষ হইল। তাঁহার অভিভাবকেরা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন কিন্তু কেহ বুঝিতে পারিলেন না যে এই বালক-কবির মন তখন নব নব সৌন্দর্য্যের পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহার কিছুদিন পরে, বোধহয় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে আবার তাঁহাকে সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু সেখানেও বেশিদিন তিনি পড়াশুনায় মনঃসন্নিবেশ করিতে পারিলেন না। প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবন তাঁহার বিশ্রী লাগিত। ঘানিগাছে চোখবাঁধা গোরুরা যেমন করিয়া নিত্য ঘুরিয়া মরে নিজেকে তাঁহার তেমনি মনে হইতে লাগিল। তাই সে-স্কুলে যাওয়াও একদিন তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে বাড়ির লোকেরা রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল আশা ছাড়িয়া দিলেন। ওই বৎসরই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তেরো বৎসর দশ মাস।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন। কোন প্রকারে ছাত্রের মনকে স্কুলের পড়ায় বাঁধিতে না পারিয়াও তিনি হাল ছাড়িলেন না। এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিলেন। শুধু 'কুমারসম্ভব' বাংলায় অর্থ করিয়া

পড়াইতে লাগিলেন এবং 'ম্যাক্‌বেথ' হইতে যে অংশটা বাংলায় বুঝাইয়া দিতেন তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রবীন্দ্রনাথ ছন্দে তর্জ্জমা করিতে পারিতেন ততক্ষণ তাঁহাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। এইভাবে কবি সমস্ত বইটির তর্জ্জমা করিয়া ফেলিলেন।

রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত পড়াইতেন। তিনিও আর ছাত্রকে সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া 'শকুন্তলা' বাংলায় অর্থ করিয়া তাঁহাকে পড়াইতে শুরু করিলেন। এই পণ্ডিত মহাশয় রবীন্দ্রনাথের অনূদিত ম্যাকবেথ পড়িয়া কী বুঝিয়াছিলেন জানি না, একদিন তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা শুনাইবার জন্য কবিকে সেখানে লইয়া গেলেন। ঘরে বহু লোকজন পরিবৃত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বসিয়া ছিলেন। কবি দুরু দুরু বক্ষে সেখানে প্রবেশ করিয়া উহা পাঠ করিলেন। বলা বাহুল্য তিনি ইঁহার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পাশে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া ছিলেন, তিনি উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, নাটকের অন্যান্য অংশ ভালই হইয়াছে তবে ডাকিনীদের উক্তিগুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অদ্ভুত বিশেষত্ব থাকা উচিত ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বাংলা ভাষায় পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তক খুব কমই ছিল, তাহার উপর ছোটদের জন্য সাহিত্যের কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমস্ত বইই ওই বয়সে পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পড়ার নেশা ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রবল। কেহ তাঁহাকে ইহা হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিত না। যদি কোন বই তাঁহাকে পড়িতে কেহ নিষেধ করিত তাহা হইলে তিনি চুরি করিয়াও তাহা পড়িতেন। অবশ্য সব বইয়ের যে সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিতেন তাহা নহে। কেননা সে-বয়স তখন তাঁহার হয় নাই। তথাপি কতক বুঝিয়া, কতক বা না বুঝিয়া তিনি পড়িয়া যাইতেন। এ

সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন আজকের দিনে বাংলা দেশের প্রতি ছেলে ও তাহার অভিভাবকদের তাহা মনে রাখা উচিত। তিনি বলিয়াছেন, "এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্যরসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম, যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না দুইই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত। সংসারটাও ছেলেদের উপর ঠিক তেমনি করিয়া কাজ করে। ইহার যতটুকু তাহারা বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সামনের দিকে ঠেলে।"

এই সময় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামক মাসিক পত্রের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। ছবিওয়ালা বড় চৌকা বই—তিনি সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতেন। 'অবোধবন্ধু' নামক আর একখানি কাগজ তখন বাহির হইত। বড়দাদার আলমারী হইতে রবীন্দ্রনাথ ইহা বাহির করিয়া আনিয়া পড়িতেন। ইহাতেই তিনি প্রথম বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কবিতা পাঠ করেন। তখনকার দিনে যে-সব কবিতা প্রচলিত ছিল তাহার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথের মন হরণ করিয়াছিল বিহারীলালের কবিতা। সেগুলি যেন দিনরাত তাঁহার মনে বাঁশি বাজাইয়া ফিরিত। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' প্রহসনখানিও কবি গোপনে এই সময় পাঠ করেন। ইহার পর আসিল বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'। ইহা প্রতি মাসের শেষে বাহির হইত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর পড়িবার জন্য মাসের পর মাস রবীন্দ্রনাথ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেন। আবার সারদাচরণ

মিত্র ও অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ের 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ'ও সে সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল অত্যন্ত লোভনীয়। তাঁহার বাড়ির লোকেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন। ইহা হইতে তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীর দুর্ব্বোধ্য মৈথিলী পদগুলির অর্থ কোন টীকার সাহায্য না লইয়া সর্ব্বদা নিজে বুঝিতে চেষ্টা করিতেন। প্রথমে তিনি সেগুলি নোট বইয়ে টুকিয়া লইতেন তারপর নিজের বুদ্ধি অনুসারে অর্থ করিতেন। এইভাবে তিনি বাড়িতে থাকিয়া সাহিত্যের সকল স্তর হইতে রসগ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

সাহিত্যচর্চ্চা

ইহার পর ক্রমশ রবীন্দ্রনাথ সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। চাকরদের শাসন পূর্ব্বেই গিয়াছিল। গৃহশিক্ষকদেরও যে দুই এক জন স্কুলের সম্পর্ক ছেদ করিবার পরও তাঁহাকে পড়াইতে আসিতেন তাঁহারাও কবির এই ব্যাপক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া বিদায় লইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি বাড়ির লোকেরা তাঁহার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে কিছু হইবে না এ সম্বন্ধে সবাই একমত। কবির নিজের প্রতি কি রকম আস্থা ছিল বলিতে পারি না, তবে তিনি সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া একমনে তখন কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনের মধ্যে তখন যে অশান্তি, যে দুরন্ত আক্ষেপ, তরুণ মনের যে স্বপ্নময় আবেগ ছিল, তাহাই কল্পনার তপ্তবাষ্পে অসংখ্য বুদ্‌বুদের মত ফুটিয়া উঠিত কবিতার ছত্রে ছত্রে। তাহাতে তাঁহার নিজের শক্তির পরিচয় ছিল কম, অন্যের অনুকরণই ছিল বেশি। কিন্তু তবুও যে-উন্মাদনা অহরহ তাঁহার অন্তরকে অস্থির ও আতপ্ত করিয়া তুলিত তাহা অকৃত্রিম, তাহা কবির নিজস্ব।

তাঁহার জ্যোতিদাদা অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কিন্তু বরাবর তাঁহার উপর আশা রাখিতেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ কবিকে কাছে কাছে রাখিয়া সর্ব্ব বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেন। কখনো তাঁহার ইহাতে ত্রুটি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি কী চোখে দেখিয়াছিলেন কে জানে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন, 'জ্যোতিদা যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম তিনি আমাকে বাইরে থেকে কোন বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানাবিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মত। তিনি বালককে শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতা দ্বারাই তিনি আমার চিত্তবিকাশের সহায়তা করতেন।' রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হইবার পর হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী তাঁহার লালনপালনের ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মত শুধু সময় কাটাইবার জন্য তিনি বই পড়িতেন না, রীতিমত তাহাতে ডুবিয়া যাইতেন এবং তাহার সমালোচনা করিতেন। এই বৌঠাকুরাণী ছিলেন কবির সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গী।

বৌঠাকুরাণী বিহারালালের কবিতার ভারি ভক্ত ছিলেন। তাঁহার কবিতার অনেক অংশ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে বিহারীবাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন এবং তাঁহার কবিতা লইয়া বহু আলোচনা করিতেন। এই সূত্রে বিহারীলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। তিনি কবিকে খুব স্নেহ করিতেন। কবি মধ্যে মধ্যে তাঁহার কবিতা ও গান সুমিষ্ট কণ্ঠে গাহিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বলা বাহুল্য ইহাতে তিনি খুশিই হইতেন।

এই সময় বিহারীবাবুর মত কবিতা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্র-নাথের মনে বলবতী হয়। তিনি কবিতা লিখিয়া বৌঠাকুরাণীকে

শুনাইতেন ; কিন্তু তিনি ছিলেন বিহারীবাবুর ভক্ত পাঠিকা তাহাছাড়া পাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে মুখে ভালো বলিলে তাঁহার অহঙ্কার বাড়িয়া যায় তাই তাঁহার এই অনুকরণ করাকে উপহাস করিতেন। তাঁহার কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধেও বৌঠান সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুখে প্রশংসা না করিয়া অন্য দুই একজন গায়কের নাম করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিষ্টি! এইভাবে তিনি কৌশলে রবীন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন উৎকৃষ্টতর রচনার জন্য।

এই সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে একটি পত্রিকা বাহির হয়। তাহার কর্ত্তৃপক্ষ এই অল্পবয়স্ক কবিকে আবিষ্কার করিয়া তাঁহার সমস্ত রচনা নির্ব্বিচারে তাহাতে ছাপিতে শুরু করিলেন। ইহার পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কোন লেখাই কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

তিনি প্রথম যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাও এই পত্রিকায় বাহির হয়। ইহা একটি পুস্তকের সমালোচনা। তদানীন্তন কালের 'ভুবনমোহিনী' নামধারিণী কোন বিখ্যাত কবির তিনখানি বই একত্রে লইয়া কবি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। আসল কবিতা কিরূপ হওয়া উচিত তাহা তিনি পরম বিজ্ঞতার সহিত ইহাতে আলোচনা করেন। ইহা লইয়া তখন রীতিমত একটা আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যপ্রতিভার এক অত্যাশ্চর্য্য পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন ইংরাজ বালক-কবি চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া ষোল বৎসর বয়সে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাতেই তিনি জগদ্‌বিখ্যাত হইয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের মনেও এইরকম একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিল। তিনি মহাজন-পদাবলী লইয়া পূর্ব্বে রীতিমত পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তাই মৈথিলীভাষা মিশাইয়া এমন কতকগুলি কবিতা রচনা করিলেন যে পণ্ডিতদের অনেকের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সেগুলি কোন প্রাচীন কবির পদাবলী

—এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কাহাকেও বলেন নাই যে এগুলি তাঁহার লেখা। 'ভানুসিংহ' নামক এক প্রাচীন কবির লেখা বলিয়া তিনি চালাইয়া দেন, নিজের নাম গোপন রাখেন। পরে যখন সেগুলি 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে প্রকাশিত হয় তখন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামক এক ভদ্রলোক জার্ম্মানীতে ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় গীতিকাব্যের সঙ্গে প্রাচীন পদকর্ত্তাদের তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া সেখান হইতে ডক্টরেট লাভ করেন। ইহাতে তিনি ভানুসিংহকে পদকর্ত্তা হিসাবে যে সম্মান দিয়াছিলেন তাহা আধুনিক কালের কোন কবির ভাগ্যে দুর্লভ।

তেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-সব কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এখন প্রচলিত আছে মাত্র দুইটি— 'ভানুসিংহের পদাবলী' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা'। অবশ্য এই দুইটি বই রচিত হইবার বহু পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাছাড়া এই বয়সের মধ্যে তিনি আরো কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি তাঁহার অপরিণত বয়সের লেখা বলিয়া কবি বাজারে বাহির করেন নাই। কিন্তু সেগুলির সাহিত্যিক মূল্য কিছু থাকুক না থাকুক, ঐতিহাসিক মূল্য যে অনেক বেশি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই 'বিশ্বভারতী' হইতে বর্ত্তমানে রবীন্দ্র-রচনাবলীর 'অচলিত সংগ্রহ' নামে একটি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কেবল কবির সেই অপ্রকাশিত রচনাগুলি স্থান পাইয়াছে। তেরো হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে কবি লিখিয়াছিলেন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'করুণা' উপন্যাস, 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'কালমৃগয়া' ও 'শৈশব সঙ্গীত' প্রভৃতি।

জ্ঞানাঙ্কুর পত্রিকাতেই 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন বয়স তেরো কি চোদ্দ। ইহা একটি কাব্যোপন্যাস; আট সর্গে বিভক্ত।

রবীন্দ্রনাথের যখন ষোল বৎসর বয়স তখন তাঁহার জ্যোতিদাদার উদ্যোগে ও বড়দাদার সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা বাহির হয়। মেঘনাদবধ কাব্যের একটি তীব্র সমালোচনা দিয়া তিনি ইহাতে প্রথম লেখা শুরু করেন। সেই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের একটি কাব্য উহাতে প্রকাশিত হয়। তাহার নাম 'কবিকাহিনী'। এই 'কবিকাহিনী'ই তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম পুস্তকাকারে বাহির হয়। কবির এক বন্ধু তাঁহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার জন্য এই বইখানি ছাপাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কবি তখন আমেদাবাদে তাঁহার দাদার নিকট ছিলেন।

'ভারতী' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাহার একজন বড় রকমের লেখক হইয়া উঠিলেন। সমালোচনা, গান, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ তিনি নিয়মিত লিখিতে লাগিলেন। এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো।

সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিলাত হইতে আই, সি, এস্ পাশ করিয়া আসিয়া আমেদাবাদে চাকুরী করিতেছিলেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি কয়েকমাসের জন্য রবীন্দ্রনাথকে লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। সেখানে মেজদাদার লাইব্রেরী হাতে পাইয়া কবি দিনরাত তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন। এবং এই সময় তিনি নানা বিষয়ে লিখিয়া ভারতীতে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার লেখনীর তখন বিরাম ছিল না, নিত্য নূতন স্বষ্টির পথে তাহা উন্মত্তগতিতে ছুটিয়া চলিত। তিনি সেখানে প্রায় ছয় মাস ছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই হইতে জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার মেজবৌঠান তখন পুত্রকন্যাসহ বিলাতে ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সেখানেই যাইতেছিলেন।

আট দিন পরে তাঁহারা এডেনে গিয়া পৌঁছিলেন, সেখান হইতে আরো পাঁচদিন পরে সুয়েজে। তাঁহারা overland যাত্রী ছিলেন, অর্থাৎ যতদূর সম্ভব স্থলপথেই বিলাত যাইবেন। তাই সুয়েজ হইতে সারারাত্রি ট্রেনে যাইয়া আলেকজেন্দ্রিয়ার বন্দরে হাজির হইলেন। আবার সেখান হইতে জাহাজে চাপিয়া চার পাঁচ দিন পরে ব্রিন্দিসি পৌঁছিলেন। তারপর সেখান হইতে রেলপথে সোজা ইটালীর মধ্য দিয়া গিয়া আল্‌প্‌স পর্ব্বতের গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া ফ্রান্সে উপস্থিত হইলেন। আবার ফ্রান্স হইতে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে।

সেখানে যাইয়া তাঁহারা একেবারে ব্রাইটনে উঠিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী সেখানে থাকিতেন, রবীন্দ্রনাথও তাই লণ্ডনে না গিয়া সেখানে রহিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ব্রাইটনের এক পাব্‌লিক স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেখান হইতে লেখাপড়া শিখিয়া ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিবেন ইহাই তাঁহার বাড়ির লোকেদের মনোভাব ছিল।

প্রথমদিন স্কুলে যাইতেই তাঁহাকে দেখিয়া সেখানকার অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন What a splendid head you have! কবিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সেই স্কুলের ছেলেরা বিদেশী বলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতি কোন অসদাচরণ করে নাই বরং অনেক সময় তাহারা কমলালেবু আপেল প্রভৃতি ফল তাঁহার পকেটে গুঁজিয়া দিয়া পলাইয়া যাইত।

ব্রাইটনে থাকিবার কালে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সেখানকার সমাজে মিশিতে শুরু করিয়াছিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি 'ভারতী'তে ছাপা হইয়াছিল তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিলাতে মধ্যে মধ্যে এমন এক প্রকার নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয় যেখানে সবাইকে ছদ্মবেশে যোগদান করিতে হয়; ইহাকে বলে 'ফ্যান্সি বল্'। এই রকম এক নৃত্যোৎসবে একবার তাঁহার নিমন্ত্রণ

হয়। নরনারীরা নানা ছদ্মবেশে আসিয়াছিল, তাই রবীন্দ্রনাথকে সাজিতে হইয়াছিল। তিনি বাংলার জমিদার সাজিয়াছিলেন, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মখমলের পাগড়ী প্রভৃতি পরিয়াছিলেন। এইভাবে সেইখানে বিলাতী নাচে রবীন্দ্রনাথের প্রথম দীক্ষা হয়।

কিন্তু ব্রাইটনে বেশিদিন রবীন্দ্রনাথকে থাকিতে হইল না। তারকনাথ পালিত তাঁহার পুত্র লোকেন পালিতের শিক্ষার জন্য সেই সময় লণ্ডনে গিয়াছিলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে একদিন বুঝাইয়া দিলেন যে সেখানে থাকিলে রবীন্দ্রনাথের লেখাপড়া হইবে না, তাঁহাকে লণ্ডনে থাকিতে হইবে।

অগত্যা তাহাই হইল। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে পালিত মহাশয়ের সঙ্গে লণ্ডনে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে আনিয়া একলা একটি বাসায় ছাড়িয়া দিলেন এবং লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেখানে তখন হেনরী মর্লী ছিলেন অধ্যাপক। শিক্ষকতার জন্য বিলাতে তখন তিনি ছিলেন বিখ্যাত। তাঁহার অধ্যাপনা রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগিত, তিনি একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিতেন। সেই সময় বাড়িতে আর একজন শিক্ষকের নিকট তিনি লাটিন ভাষাও শিখিতেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উহা ছিল অত্যাবশ্যক।

লণ্ডনে থাকিবার সময় রবীন্দ্রনাথ বারকয়েক পার্লামেণ্টে গিয়াছিলেন বক্তৃতা শুনিবার জন্য। তখন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ জন ব্রাইট ও গ্লাড্‌স্টোনের যুগ। তাঁহাদের বর্ণনা দিয়া তিনি সেই সময় চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত করিলাম—'বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো; ব্রাইটকে আমি যখন প্রথম দেখি, তখন আমি তাঁকে ব্রাইট বলে চিনতেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাঁর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারিনি'।

তারপর গ্লাড্‌স্টোনের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন, 'এমন সময় গ্লাড্‌স্টোন উঠলেন ; গ্লাড্‌স্টোন ওঠবামাত্রই সমস্ত ঘর একেবারে ঘোর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্লাড্‌স্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হতে লাগল, সে এমন চমৎকার যে কী বলবো! কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন-গর্জ্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতিটি কথা ঘরের যেখানে যে কোন লোক বসেছিল, সকলেই একেবারে সমস্ত শুনতে পাচ্ছিল'।

রবীন্দ্রনাথের মনে সেই বয়সেই জাতীয়তাবোধ এমনভাবে জাগিয়াছিল যে যেসব বাঙ্গালীর ছেলেরা তখন আহারে বিহারে ভাবে ভঙ্গীতে ইংরাজদের অনুকরণ করিত তাহাদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। বিলাতে নানা রকম প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও কবি কোনদিন তাঁহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারান নাই।

লণ্ডন হইতে আবার তিনি কিছুদিনের জন্য মেজ বৌঠাকুরাণীর কাছে গিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা ডিভনশায়ারে টর্কিনগরে বাস করিতেছিলেন। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতি মনোরম ইহা কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই স্থানে তিনি 'ভগ্নতরী' নামে একটি গাথা রচনা করেন।

তারপর সেখান হইতে আবার তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া যান। এবারে ডাক্তার স্কট নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে তিনি অতিথি হইয়া থাকেন। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী এরূপ ভদ্র ও আন্তরিক ব্যবহার কবির সঙ্গে করিয়াছিলেন যে অল্পদিনের মধ্যে তিনি তাঁহাদের ঘরের ছেলের মত হইয়া যান। এদিকে বিলাত হইতে সেই সময় তিনি যে চিঠিপত্রগুলি পাঠাইয়াছিলেন তাহা 'ভারতী'তে ছাপা হইবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা দারুণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সব পত্রে বিলাতের স্ত্রী-স্বাধীনতার অজস্র প্রশংসা করিয়া আমাদের দেশের নারী-অবরোধ প্রথার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী'র সম্পাদক। তিনি নিজে কবির এই সব মতের প্রতিবাদ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ আবার তাহার জবাব দিলেন। এইভাবে কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহাদের তর্কবিতর্ক সব সেই কাগজে ছাপান হইতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স তখন বেয়াল্লিশ—তরুণের সঙ্গে প্রবীণের চিরন্তন সঙ্ঘর্ষ!

এই সময় মহর্ষি তাঁহাকে এক চিঠি লিখিলেন দেশে ফিরিয়া আসিবার জন্য। পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কয়েকমাস পরেই রবীন্দ্রনাথ আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইহাতে কবি খুশিই হইলেন। দেশের জন্য তাঁহার মন তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। "দেশের আলোক, দেশের আকাশ যেন আমাকে ভিতরে ভিতরে ডাক দিতেছিল।"

প্রতিভার বিকাশ

দেশে ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। 'ভগ্নতরী' প্রকাশিত হইলে তাহা পড়িয়া ত্রিপুরার মহারাজা এত খুশি হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীকে পাঠাইয়া এই তরুণ কবিকে সম্মানিত করেন। এই সময় হইতে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজবংশের যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় তাহা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে!

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি-প্রতিভা' রচনা করেন। ইহা এক নূতন ধরণের গীতিনাট্য। বাংলাদেশে ইহাই প্রথম। ইহা পাঠযোগ্য কাব্যগ্রন্থ নহে, ইহা সুরে নাটিকা। বাল্যকাল হইতেই কবি দেশী সুরের আবহাওয়ায় মানুষ, নিজে গান রচনা করিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করিয়া বহুবার বহুলোককে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার উপর বিলাত হইতে 'আইরিশ মেলডীজ' ও অন্য বহু প্রকারের

ইংরাজী সঙ্গীত শিখিয়া ও শুনিয়া আসিয়া ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ফলে দেশী ও বিদেশী সুরের সমুদ্র মন্থন করিয়া যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহাই ইহার ছত্রে ছত্রে সুরে, লয়ে, তানে অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজে ইহাতে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। যাঁহাদের ইহা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে তাঁহারা ভাগ্যবান। ভবিষ্যতে নাট্যসাহিত্যে ও অভিনয়ে তাঁহার প্রতিভার যে নব নব উন্মেষ হইয়াছিল ইহাতে তাহার সূচনা হয়। যে সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথকে অমর করিয়াছে, ভাষা ও সুরের মহামিলনে যাহার জন্ম, তাহারও প্রথম বিকাশ হয় এই গীতিনাট্যে!

বিলাত হইতে ইউরোপীয় সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া আসিবার ফলে রবীন্দ্রনাথের চোখে তখন বাংলা-সাহিত্যের দৈন্য আরো বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। বাংলাদেশের কবিতা তাঁহার কাছে যেন প্রাণহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মামুলি কল্পনা, মামুলি ভাব যে ইহার জন্য দায়ী তাহাতে আর তাঁহার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি ইহার কারণ ব্যক্ত করিয়া তখন বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সেই রচনাগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে কী গভীরভাবে তিনি তখন বাংলা কবিতার বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলেন।

এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন—"স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীবভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙালীকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্দ্ধেক চক্ষু বুজিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প।

কয়জন বাঙালী কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়!...বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না।...সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া।...এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমের মানবসমাজে অনবরত যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই অনবরত সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। বাঙালীর জীবনে সেই স্বচ্ছ আনন্দ নাই, সংগ্রাম নাই, তাই এখানে সব জিনিস সঙ্কুচিত কুব্জ। এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান্ চরিত্রচিত্রই বা কোথায় থাকিবে; আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কিরূপে বর্ণিত হইবে!"

বাংলাদেশের এই দুঃখে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন হইতে ইষ্টদেবতাকে জাগাইবার জন্য ভক্ত যেমন পাষাণ-প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কঠোর তপস্যার নিমগ্ন হয় তেমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতাকে জাগ্রত করিবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। অবশেষে ভক্তের প্রার্থনায় একদিন দেবী প্রসন্ন হইলেন। দেখিতে দেখিতে বিশ্বের যেখানে যত প্রাণ ছিল সব যেন একসঙ্গে আসিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হইল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই ইহারই উদ্বোধন পরিলক্ষিত হয়। শুধু প্রাণ, শুধু গতি—নির্ঝরিনীর উন্মত্ত জলধারার মত নিত্য নব নব আবর্তের সৃষ্টি করিতে করিতে কল-কল্লোলে ছুটিয়া চলিয়াছে—কোন্ সুদূর অলক্ষ্যে, কোন্ বৃহত্তর প্রাণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য কে জানে।

তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার শুধু কয়েকটি কবিতার নাম মুখস্থ করিলে বা পড়িলে চলিবে না; তিনি যতগুলি বই লিখিয়াছেন সব গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া তিনি ত কেবল কবি নহেন—মনীষী জ্ঞানী ও শিক্ষাগুরু। কবি ও মনীষীর অখণ্ডরূপ তিনি। তাই কেবল কবিতা পড়িলে তাঁহাকে খণ্ডভাবে জানা যায়। পূর্ণভাবে জানিতে হইলে তাঁহার সমগ্র গদ্যরচনাও পড়িতে ও জানিতে হইবে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' তাঁহার উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের রচনা। সেই সময়

তাঁহার রুদ্ধ জীবন বাহিরের স্পর্শ লাগিয়া গতিবেগ পায় নাই—তাহা ছিল আপনার নব যৌবনের মদির গন্ধে শিহরিত, আশা নিরাশার ক্রন্দনে মুখরিত।

এই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কবির প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য হইলেও ইহা বাহির হইবার পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাড়িতে যান কিন্তু তিনি উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি একগাছি ফুলের মালা তাঁহার গলায় যেমন পরাইয়া দিতে গেলেন, রবীন্দ্রনাথ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র অমনি সেই মালাটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া রবীন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। এই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র একটি কবিতার খুব প্রশংসা করিয়া তিনি রমেশচন্দ্রকে সেই বইটি পড়িতে অনুরোধ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যসম্রাট, তাঁহার নিকট হইতে এই পুরস্কার লাভ করিয়া কবি সেদিন সত্যিকারের আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

সেই সময় 'জুতা ব্যবস্থা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেশাত্মবোধের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় সমগ্র জাতিকে তিনি কী চোখে দেখিতেন এবং কত ভালবাসিতেন। একদিন 'ইংলিশম্যান' কাগজে সম্পাদকীয় স্তম্ভে এইরূপ কয়েক লাইন ছাপা হইয়াছিল, "গবর্ণমেণ্ট একটি নিয়ম জারী করিয়াছেন যে, যেহেতুক বাঙ্গালীদের শরীর অত্যন্ত বেজুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে যে বাঙালী কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে।"

দেশবাসীর এই অপমানে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রাণের জ্বালা সম্বরণ

করিতে না পারিয়া লিখিয়াছিলেন—"আজ অন্য কোন দেশে যদি কোন কাগজ ঐরূপ অপমানের আভাষমাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।"

দেশপ্রেমের যে বীজ সেদিন তাঁহার মনে অঙ্কুররূপে প্রথম দেখা দিয়াছিল পরবর্ত্তী জীবনে একদিন তাহাই বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়।

সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনা করিবার কালকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সন্ধিক্ষণ বলা যাইতে পারে। সাহিত্যে—গদ্য, পদ্য, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, উপন্যাস সমালোচনা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে—এবং সমাজসংস্কারে ও রাজনীতিতে তখন তাঁহার প্রতিভার প্রথম প্রসন্ন বিকাশ দেখা দিয়াছিল।

সেই সময় আবার রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন কিন্তু কোন কারণে তাঁহার যাইবার পথে বিঘ্ন ঘটে। মাদ্রাজ হইতে তিনি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি চন্দননগরে গঙ্গার ধারে জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। এই সময় বহু সৎসাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেন।

আবার তথা হইতে তাঁহারা সকলে সদলবলে কলিকাতা গিয়া সদর স্ট্রীটে একটি বাড়িতে বাস করেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নামক কবিতাটি তিনি এইখানে রচনা করেন। সদর স্ট্রীটের এই তুচ্ছ বাড়িটি কবির সেই প্রদীপ্ত প্রতিভার সাক্ষী হইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে!

ইহার পর কিছুদিনের জন্য রবীন্দ্রনাথ কারোয়ার সমুদ্রতীরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নিকটে

কর্ণাটের প্রধান সহর। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। ছোট ছোট পাহাড় ও ঝাউগাছে ঘেরা সমুদ্রের এই বন্দরটি যেমন নির্জ্জন, তেমনি পরিচ্ছন্ন। কবির মেজদাদা তখন এখানকার জজ ছিলেন। এই জায়গাটি কবির বড় ভালো লাগিত। এইখানে থাকিয়া তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স তখন প্রায় তেইশ বৎসর। খুলনা জেলার বেণীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা মৃণালিনী দেবীর সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল, ইংরাজি ১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর।

ঠাকুর-পরিবারে তখন একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোত বহিতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ নিদারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে এই বৌঠাকুরাণীর কাছে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের বিকাশের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি ঋণী ছিলেন ইঁহার কাছে। তাই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে কবি 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন।

প্রথমে এই শোকের আঘাতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই ইহা তাঁহার মনে আবার এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিল। তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখনীর উৎস যেন নূতন করিয়া খুলিয়া গেল।

ইহার পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ তখন 'ভারতী'র সম্পাদক পদ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা করিতেছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে

তখন একটা প্রাণের নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক এক প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে তাহার জবাব দেন। ইহা লইয়া কাগজে তাঁহাদের মধ্যে দারুণ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশ্য কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু নিজে রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লিখিয়া এই বিরোধের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

এই সময় দুই জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। ইঁহাদের একজন হইতেছেন কবি প্রিয়নাথ সেন আর একজন সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদার। ইঁহারা দুইজনেই নিয়মিতভাবে সন্ধ্যায় কলিকাতাস্থ বাটীতে তাঁহার ঘরে সমবেত হইয়া গানে সাহিত্য-সমালোচনায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীশবাবু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের আজীবন সঙ্গী। তাঁহাদের এই বন্ধুত্ব এক দিনের জন্য শিথিল হয় নাই। উভয়ে উভয়ের সাহচর্য্যে এত আনন্দ লাভ করিতেন যে ক্ষণিকের বিচ্ছেদে কাতর হইয়া পড়িতেন। শ্রীশবাবু যখন কলিকাতা হইতে সাব্ ডেপুটীর কাজ পাইয়া গয়ায় চলিয়া যান তখন রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁহাকে এইভাবে চিঠি লিখিয়াছিলেন—

বন্ধু হে, পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরসায়,
কাজ-কর্ম্ম কর সায়, এসো চটপট্ !
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য তুমি কর ডেপুটিত্ব,
হেথা প'ড়ে মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্।

তারপর 'কড়ি ও কোমল' ও 'মানসী'র যুগ। ইহারা রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ যৌবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিল। তখনো পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপর সংসারের কোন দায়িত্ব পড়ে নাই, মধুলুব্ধ ভ্রমরের মত তিনি শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার চঞ্চল মন তখন চির-অতৃপ্ত বাসনায় কস্তুরী মৃগের মত পাগল হইয়া

ঘুরিয়া মরিতেছে। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার বিলাত যাইবার এক সঙ্গী জুটিয়া গেল। তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগস্ট আবার ইউরোপ ভ্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সেই বৎসর হইতেই তাঁহার উপর জমিদারীর কার্য্যভার পড়িল। তাঁহার এই সুললিত কাব্যজীবনের মধ্যে বিপুল জমিদারীর হিসাবনিকাশ—দলিল, নথিপত্র, হাতচিঠা, নালিশ, মোকদ্দমা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল বলিয়া তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুতভাবে নিজেকে এই কর্ত্তব্যকর্ম্মের সঙ্গে মানাইয়া লইলেন। তিনি এই জমিদারী-পরিচালনা কার্য্যে এরূপ সুদক্ষতার ও হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের আদর্শ জমিদার বলিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গেল।

জমিদারীর এই দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বঙ্গপল্লীর প্রকৃতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই বাংলাদেশের অন্তরের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বহুদিন তিনি উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় বাংলার পল্লীজীবনকে অন্তরঙ্গভাবে তিনি জানিয়াছিলেন। শত শত পল্লীবাসীর সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়াছিল। কতবার তিনি তাহাদের দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের সুখে আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহাদের জীবনের নানা খুঁটিনাটি লইয়া ব্যাকুল চিন্তায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র পাতায় পাতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যাহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান ছিলেন বলিয়া চিরকাল ধনীদের সুবিধা-অসুবিধা লইয়াই সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, ইহা পড়িলে তাহাদের সে ধারণা নিশ্চিত দূর হইয়া যাইবে। বাংলার পল্লীবাসীরা নিজেদের দুর্দ্দশার যে কাহিনী না জানে তিনি তাহা তদপেক্ষা

অধিক জানিতেন। কখনো পদ্মার বক্ষে নৌকা ভাসাইয়া, কখনো নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন পল্লীর কুটীরে বাস করিয়া, কখনো দুর্গম স্থানে তাঁবু খাটাইয়া তিনি গ্রাম্যজীবনের অন্তর ও বাহির দেখিয়াছিলেন।

তাঁহার জমিদারীর মধ্যে শিলাইদহের নদীতট ও সাজাদপুরের কাছারীবাড়ি ছিল অতি প্রিয়—এই স্থানে তিনি বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

এই সময় 'হিতবাদী' বাহির হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প লেখেন—ইহাই প্রথম তাঁহার গল্পে হাতেখড়ি। ইহার পর 'সাধনা'র যুগে গল্পসাহিত্যে তাঁহার প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটে। বাংলা ১২৯৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সেই ভাবী কর্ম্মভূমি ও সাধনাক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীতকার্য্যে যোগদান করিয়া এই শুভ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

১৩০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনার ভার তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। তখন হইতে যতদিন পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহাকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গদ্যযুগ বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে তিনি নিত্যনূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার দুই একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে দেশে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া যায়। তিনি যে শুধু কবি কিংবা সাহিত্যিক নহেন, দেশপ্রেমিকও বটে, এই সুস্পষ্ট ধারণা দেশবাসীর মনে জন্মিয়াছিল।

ভারতে তখন জাতীয়তাবোধের যে নূতন রূপ দেখা দিয়াছিল তাহার প্রধান পুরোহিত ছিলেন মারাঠাজাতির গৌরব বালগঙ্গাধর তিলক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিলকের খুব ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও তিনি কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একবার কোন লোকমারফৎ

তিলক রবীন্দ্রনাথের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাঁহাকে ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবার অনুরোধ জানাইয়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে টাকা গ্রহণ করেন নাই, ফেরৎ দিয়া বলিয়াছিলেন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি ইউরোপ যাইতে পারিবেন না।

ইহার উত্তরে তিলক আবার কবিকে বলিয়া পাঠান যে তিনি রাজনীতি লইয়া থাকেন ইহা একেবারেই তাঁহার অভিপ্রায় নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে হইল দেশনেতারূপে যে টাকা তিলক দেশবাসীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সে টাকা লইয়া তিনি যদি রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন হইতে সরিয়া থাকেন তাহা হইলে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে একবার মহামতি তিলকের সঙ্গে বোম্বাইয়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয়। তিনি কবিকে বলিয়াছিলেন, "রাষ্ট্রনীতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে পৃথক রাখলে তবেই আপনি নিজের কাজ—সুতরাং দেশের কাজ—করতে পারবেন; এর চেয়ে বড় আর কিছু আপনার কাছে প্রত্যাশা করিনি।"

অবশ্য ইহার পূর্বে ইংরাজী ১৮৯০ সালে যখন কলিকাতায় নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হয় তখন রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাহিয়া তাহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আবার ছয় বৎসর পরে কলিকাতায় দ্বাদশ বার্ষিক অধিবেশন হইলে কবি নিজের রচিত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানটি গাহিয়া সকলের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বরাবর রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন বলা যাইতে পারে, আবার ছিলেন না-ও বলা যাইতে পারে—কেননা এই দুইটি কথাই সত্য। তিনি দেশের বড় বড় নেতাদের মত কখনো রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই; তবে যখনই দেশের ডাক পড়িয়াছে তখনই

নির্ভীকভাবে যাহা সত্য তাহা বলিতে কখনো ভয় পান নাই। রবীন্দ্রনাথ শুধু রাজনীতিক স্বাধীনতা চাহেন নাই—তিনি ভারতবাসীর জন্য সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা কামনা করিয়াছিলেন। যে স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাষ্ট্রীয় মুক্তি তাহার জন্য কখনো তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নাই, দেশবাসীর কল্যাণ কামনায় বার বার ছুটিয়া আসিয়াছেন। ইহাকে তিনি তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন।

তাই যখনই দেশের শিক্ষায়, সভ্যতায়, ধর্ম্মে, কর্ম্মে কোন অন্যায় বা অবিচার তাঁহার চোখে পড়িয়াছে তখনই তাঁহার লেখনী সুতীক্ষ্ণ তরবারির মত ঝলসিয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর কোন অপমান তিনি সহ্য করেন নাই, ক্ষিপ্ত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৩০০ সালে 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরীতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধ্যে যে ভেদ কেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাই তিনি দেখাইয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সেই সময় পুণাতে তিলকের সাহায্যে গোবধ-নিবারণী সভা স্থাপিত হয় এবং ইহা লইয়া হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'য় লিখিয়াছিলেন "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, উহা গবর্ণমেণ্টের পলিসি সম্মত না হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ফুৎকারে যে ঐ অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে —আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস।

"অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কংগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান এবং মুসলমানদের

দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।”

মহামতি তিলক মারাঠা জাতির অতীত গৌরবকে ভারতে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রতি বৎসর ‘শিবাজী’ উৎসব করিতেন। একবার এই উপলক্ষে ‘কেশরী’ পত্রিকায় যেসব রচনা বাহির হইয়াছিল তাহার চারদিন পরে বোম্বাইয়ের প্রেস অফিসার র‍্যাণ্ড সাহেব পথিমধ্যে সহসা নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তিলককে পরোক্ষভাবে দায়ী করিয়া তাঁহাকে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়। ইহার জন্য মকদ্দমা চলিয়াছিল বহুদিন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই মকদ্দমায় কিছুদিন সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন।

ভারতে তখন বড়লাট হইয়া আসিয়াছিলেন লর্ড কার্জ্জন। তিনি এই রাজনৈতিক আন্দোলন যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে তাহার জন্য এবং বিশেষ করিয়া খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ‘সিডিশন্ বিল’ নামক এক নতুন আইন পাশ করাইয়া লইলেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ‘টাউনহলে’র এক বিরাট জনসভায় ‘কণ্ঠরোধ’ নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। আজ হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ভারতের সাম্প্রদায়িকতা ও শাসননীতির সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এখন তাহা ভারতবাসী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে।

দেশের শিক্ষাসমস্যা লইয়া তদানীন্তন শিক্ষব্রতীদের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তিনি বহু তর্কবিতর্কে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাংলাভাষার সাহায্যে যাহাতে আমাদের স্কুল-কলেজের সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলির শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার জন্য তিনি ‘শিক্ষার হেরফের’ নাম দিয়া এক প্রবন্ধের অবতারণা করেন। তখন নাটোরের এক জনসভায় তিনি

এই শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাই সরকার কিছুকাল পরে যখন এই বাংলা ভাষাকে খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে আসাম ও উড়িষ্যাকে বাংলাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বক্ষে যে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল তাহার জ্বালা এখনো কবির সেই সময়কার লেখায় অনুভব করা যায়। আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-যে মাতৃভাষাকে শিক্ষার প্রধান বাহন করিয়াছেন ইহাও যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিকল্পনা একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দেশকে তিনি সত্য সত্যই মায়ের মত ভালবাসিতেন। তাই দেশকে সকল বিষয়ে উন্নত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। শুধু কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি দিনের হিসাব লইলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় যখন প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছিল তখন তিনি দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যান নাই। ইহা নিবারণার্থে সরকারকে দ্রুত সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন এবং ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া আর্ত্তদের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাহাছাড়া দেশের ভালমন্দ যাঁহাদের উপর অনেকখানি নির্ভর করে সেই জমিদার-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বার বার একথা বলিয়াছেন, "এদেশে পূর্ব্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না, তাহা দান, অর্চ্চনা, কীর্ত্তি স্থাপন, আর্ত্তগণের আর্ত্তিচ্ছেদ, দেশের সাহিত্যের পালন পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদারগণ প্রতিদিন হারাইতেছেন।"

আবার জননায়কদেরও তিনি বহুবার বলিয়াছিলেন, "দেশকে

যদি আপন করিতে চাও ত দেশের ভাষা বলিতে হইবে, দেশের বস্ত্র পরিতে হইবে। ইংরাজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসঙ্গত।"

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রকৃত কর্ম্মী। একদিকে তিনি যেমন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন অন্যদিকে তেমনি আবার সাহিত্যচর্চ্চাও করিতেন। বহির্জগতের সঙ্গে ভাবজগতের এমন অদ্ভুত সমন্বয় আর কেহ কখনো করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই সংসারের দাবী মিটাইতে যখন তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তখনই তাঁহার লেখনী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা বাহির হইয়াছে। সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। 'চিরকুমার সভা' নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক নাটকটি রবীন্দ্রনাথ মাত্র দুইদিনে লিখিয়াছিলেন! দুই দিন, দুই রাত্রি তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া এবং সামান্য কিছু দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া ইহার রচনা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বৈষয়িক কাজে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে উহার চেয়ে বেশি সময় ইহার জন্য করিতে পারেন নাই। জগতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত দুর্ল্লভ! বোধ হয় এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট রচনা আর কোন দেশের কোন সাহিত্যে কখনো সম্ভব হয় নাই।

'নৈবেদ্য' রবীন্দ্রনাথের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়া নহে ইহা তাঁহার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। বাল্যকাল হইতে উপনিষদ শিক্ষার ফলে তাঁহার মনে যে অধ্যাত্মবোধ জাগিয়াছিল তাহারই পূর্ণতর বিকাশের আকুতি ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন আফ্রিকায় বুয়রদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে ভারতে নানারকমের বিরোধ ও

বৈষম্য দেখা দেয়—ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির যোগসূত্র অসংখ্য জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়ে তখন ভারতে আবার শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য যেসব সুন্দর চিন্তা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহাই নিবেদিত হইয়াছে এই নৈবেদ্যের কবিতায়। এই বইটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং ইহার আশীর্ব্বাদস্বরূপ তিনি শান্তিনিকেতনে একটি ব্রহ্মচর্য্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহর্ষি পুত্রের এই কামনা পূর্ণ করিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চল্লিশ।

রবীন্দ্রনাথ তখন স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করিবার জন্য চলিয়া গেলেন এবং সেখানে প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী এক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপন করিলেন ১৯০১ খৃষ্টাব্দে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে যখন ভারতবাসীরা বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছিল সেই সময় রবীন্দ্রনাথ এই আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর চোখের সম্মুখে আবার ভারতের অতীত গৌরবের ছবি তুলিয়া ধরিলেন।

রবীন্দ্রনাথের উপর তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়িয়াছিল। একখানি পত্রে তিনি তখন এই ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের আদর্শ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন—"মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্ব্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটীর রচনা করিয়া পত্নী বালক-বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য, অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে

নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্ব্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্ম্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাইরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে—যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধন-পীড়নের বাইরে। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত—আমার সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি; সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক।......

যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে 'নালন্দা' অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি ইহা দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে? আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, আমাদের স্বাধীনতা; ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অবমাননা মুক্তির একমাত্র উপায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকজন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি আসিয়া কবির সহিত মিলিত হইলেন এবং আশ্রমের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ইংরাজ ও একজন সিন্ধি খৃষ্টান ছিলেন। কবি নিজেও আশ্রমের বালকদের পড়াইতেন, তাহাদের সঙ্গে খেলাধূলা করিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে একঘরে বাস করিয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, সমবয়সীর মত তাহাদের মনের সকল কল্পনাকে নানা রঙে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেন।

এই আশ্রমের যাবতীয় ব্যয় কবিকে বহন করিতে হইত। ইহার জন্য তাঁহাকে যে দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয় কিন্তু তিনি হাসিমুখে সব সহ্য করিয়াছিলেন। এই আশ্রমটি তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় ছিল। তাই ইহার উন্নতির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার পুরীর বাড়ি

বিক্রয় করিয়া, নিজের মাসোহারার টাকা দিয়া, স্ত্রীর গহনা বেচিয়া এবং তাঁহার নিজস্ব লাইব্রেরীর মূল্যবান বই পর্য্যন্ত বিক্রী করিয়া ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন! তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ইহাতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতেন, তিনি সর্ব্বদা হাসিমুখে স্বামীর সুখদুঃখের সমান ভাগ লইতেন। তিনি যদি সেদিন কবির পার্শ্বে আসিয়া এইভাবে না দাঁড়াইতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এই স্বপ্ন একদিন সত্যে পরিণত হইতে পারিত না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কবি তাঁহার এইরূপ সুযোগ্যা পত্নীকে অকালে হারাইলেন! ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর দুই পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবি 'স্মরণে' নামক একটি কবিতার বই লিখিয়া তাহা স্ত্রীর নামে উৎসর্গ করেন।

রবীন্দ্রনাথের দুই পুত্র—রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথ; তিন কন্যা—মাধুরী, রেণু ও মীরা। ইঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই।

জীবনের পথে

ইহার কিছুদিন পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়ে। লর্ড কার্জ্জন বাংলাদেশকে দুর্ব্বল করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার এক প্রস্তাব আনয়ন করেন। বড়লাটের এই জবরদস্ত শাসননীতিতে সমস্ত দেশবাসী ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ইহাই ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে বিখ্যাত। শুধু ইহা করিয়াই কার্জ্জন তৃপ্ত হন নাই। ইহারই সঙ্গে আবার বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষাকে খর্ব্ব করিবার জন্য তিনি 'ইউনিভার্সিটী বিল' আনয়ন

করেন। তাঁহার মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছিল যে সুলভে ইংরাজীবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়াই বাঙ্গালীরা বুঝিতে শিখিয়াছে যে তাহারা পরাধীন তাই স্বাধীনতালাভের জন্য নানারকম আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছে। সেইজন্য এই বিল তিনি এমনভাবে প্রণয়ন করিয়াছিলেন যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অত্যধিক ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে এবং সকলের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করা সম্ভব না হয়।

রবীন্দ্রনাথ সরকারের এই হীন মনোবৃত্তির সমালোচনা করেন তীব্র ভাষায় 'বঙ্গদর্শনে', এবং ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বড় বড় জনসভায় অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া, স্বদেশী গান গাহিয়া, সমগ্র ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন—বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত বক্তা ও জননায়কের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই অভূতপূর্ব্ব সম্মেলনে দেশের সর্ব্বত্র এক অভাবনীয় জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল।

বাঙালীরা বাংলাদেশের এই দ্বিধাবিভক্তরূপ অস্বীকার করিল এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সেই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন যে বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিল তাহার নাম 'রাখিবন্ধন'। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইহার প্রধান হোতা। তিনি ইহাকে প্রচার করিবার জন্য প্রথম যে ইস্তাহার দিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনে তাহার ভাষা এইরূপ ছাপা হইয়াছিল—"আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে; কিন্তু ঈশ্বর-যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই, 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'।"

আমাদের শাস্ত্রে পুণ্যকর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে উপবাস করিবার বিধি আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সেই দিনটিতে অরন্ধনের নির্দ্দেশ দেন।

সেদিন সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! সে কি মহতী অনুপ্রেরণা! রবীন্দ্রনাথ অনশনে নগ্নপদে গঙ্গার ঘাটে গিয়া যথারীতি স্নান করিয়া উঠিলেন আর হাজার হাজার বাঙালী ধনী-দরিদ্র-নির্বিবশেষে আসিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের রচিত এই গানটি গাহিয়া গাহিয়া সকলে কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইলেন।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান!

সেদিন কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত আসিয়া ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে পথেঘাটে, গৃহদ্বারে যাহাকে দেখিলেন তাহার হাতে রাখি বাঁধিয়া দিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল। উপবাসক্লিষ্ট নরনারীর মিলিত কণ্ঠসঙ্গীতে বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেইদিন অপরাহ্ণে কবি এমন মর্ম্মস্পর্শী এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন যে সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী কার্য্যের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। সেদিন রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের ভিতর দিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে যে প্রবল প্রাণধারার সঞ্চার করিয়াছিলেন আজও তাহা নিঃশেষিত হয় নাই। সেই দিন হইতে দেশে যুবশক্তি জাগ্রত হইল। নেতাদের কথায় শত শত যুবক মহোৎসাহে স্বদেশী কাজে লাগিয়া গেল। পিকেটিং করা, সভা করা, শোভাযাত্রা করা, গ্রামে গ্রামে স্বদেশী প্রচার করা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে তাহারা মাতিয়া উঠিল।

ইহার পর হইতে গানে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে তিনি চিরদিন দেশবাসীর অন্তরে নব নব প্রেরণা জাগাইয়াছেন। সেই বৎসর 'বিজয়া-সম্মিলনী'

উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ হাজার হাজার লোকের সম্মুখে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

'হে বন্ধুগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সম্মিলনের দিনে হৃদয়কে একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সর্ব্বত্র প্রেরণ কর। উত্তরে হিমাচলের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত, নদী-জালজড়িত পূর্ব্বসীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত কর। যে চাষী চাষ করিয়া এতক্ষণ ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর—যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, শঙ্খমুখরিত দেবালয়ে যে পূজারী আগত হইয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর, অস্তসূর্য্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ কর। আজ সায়াহ্নে গঙ্গার শাখাপ্রশাখা বাহিয়া ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাংলা দেশের পূর্ব্বে পশ্চিমে আপন অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও,—আজ বাংলা দেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দেমাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্—একবার করজোড় করিয়া নতশিরে বিশ্বভুবনেশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান!"

এই সময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজের আদর্শে দেশের বহুস্থানে ও তাঁহার নিজের জমিদারীতে বয়ন-বিদ্যালয়, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করেন। স্বাদেশিকতা তখন তাঁহার মধ্যে এরূপ প্রবল

হইয়াছিল যে শান্তিনিকেতনের সেই তপঃস্নিগ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সেই আদর্শ অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শান্তি-নিকেতন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার একটি বাস্তবরূপ। তাই যখন যে ভাব তাঁহার মনে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহারই আলোকসম্পাত হইয়াছে তাহার উপর।

ইংরাজী ১৯০৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পরলোকগমন করেন। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ পিতাকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন।

ইহার পর কবি জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। কি ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশ আবার জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে ধর্ম্মেকর্ম্মে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে তাহা লইয়া রীতিমত আলোচনা শুরু করিলেন। প্রবন্ধ লিখিয়া বক্তৃতা দিয়া তিনি তাহা দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় বাংলাদেশের বহু ধনীর অর্থে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। যেদিন সাড়ম্বরে ইহার উদ্বোধন হইয়াছিল সেদিন টাউন হলে বাঙালী জাতির জীবনে এক নূতন চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল!

সেই সময় তিনি বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে যান। আবার ১৯০৬ সালে কলিকাতায় যখন দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কংগ্রেস ও প্রদর্শনী হয় সেই সময় ইহার সহিত যে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া তৎকালীন আরো বহু সভা-সমিতিতে ও কাগজে তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক আলোচনা করেন।

এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের জাতীয়তা বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ইহার পর কিছুকাল এই সব কর্ম্মোত্তেজনা হইতে দূরে থাকিয়া তিনি আপনার শান্ত ও সুন্দর ভাবরাজ্যে নিজেকে সমাহিত করেন। এই সময় তিনি যে সব গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ধর্ম্মভাব ও মহত্তর চিন্তার বিষয়ই ছিল বেশি। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে ইহার চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়।

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৩১৭ সালের ২৫শে বৈশাখ কবি যখন পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহার দেশবাসীরা মিলিত হইয়া টাউনহলে তাঁহাকে এক মানপত্র দান করিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবার জন্য ইতিপূর্ব্বে দেশবাসীর নিকট হইতে সম্মিলিতভাবে এইরূপ বিরাট অভিনন্দন তিনি আর লাভ করেন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে কবিকে মানপত্র দিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। এই উপলক্ষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বিখ্যাত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন তাহার আরম্ভ এইরূপ—

জগৎকবি-সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব্ব ;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি
হে গুণি! তব প্রতিভাগুণে জগ-কবি সর্ব্ব।

ইহার এক বৎসর পরে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেসের ষষ্ঠবিংশতিতম অধিবেশন উপলক্ষে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা' এই জাতীয়-সঙ্গীতটি তিনি রচনা করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের মনে আবার বিদেশ যাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়।

তিনি ১৩১৯ সালের প্রথম দিকে বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্ব্বে তিনি নিজে বাছিয়া বাছিয়া প্রায় এক শত গান ও কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং এই ইংরাজী পাণ্ডুলিপির তিনি নাম দিয়াছিলেন 'গীতাঞ্জলি'।

অনেকের মনে হইতে পারে, হঠাৎ তিনি এইরূপ করিলেন কেন? ইহার অবশ্য একটু ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের রসজ্ঞ সমালোচক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী যখন বিলাতী উপাধি লাভ করিবার আশায় অক্সফোর্ডে পড়িতে গিয়াছিলেন সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা নিজে অনুবাদ করিয়া সেখানকার ছাত্রদের শুনাইয়ছিলেন। সেই সময় ছাত্রদের এই কবিতাগুলি খুব ভাল লাগিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ভগিনী নিবেদিতা ১৯২২ সালের 'মডার্ণ রিভিয়্যু'তে রবীন্দ্রনাথের অতি বিখ্যাত গল্প 'কাবুলি-ওয়ালা'র যে ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া বিলাতের কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তি কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হন। ইঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোদেনস্টাইন ছিলেন প্রধান। তিনি বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লিখিয়া জানিতে চান কবির এই রকম আরো গল্প আছে কিনা। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে আলাপ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন অজিত চক্রবর্ত্তীর অনূদিত সেই কবিতাগুলি পাঠাইয়া দেন। সেই কবিতাগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদের বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে বিলাত যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এইভাবে পত্র লেখেন যে কতকগুলি রসজ্ঞ হৃদয় তাঁহার জন্য সেখানে প্রতীক্ষা করিতেছে। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার এবং ইংরাজী গীতাঞ্জলি রচনা করিবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বিলাত যাইয়া কবি রোদেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

এবং সেইখানে রোদেনস্টাইনের বাসায় ক্রমশ ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আলাপ হইল। রোদেনস্টাইনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন আইরিশ কবি ইয়েটস্। তিনি কবির ইংরাজী গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিটি লইয়া তাঁহাকে পড়িতে দেন। ইহা পড়িয়া কবি ইয়েটস্ এত বিচলিত হইয়াছিলেন যে এই সম্বন্ধে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—I have carried the manuscript of these translations about with me for days, reading it in railway trains, or on the top of Omnibuses and in restaurants, and I have often had to close it, lest some stranger would see how much it moved me.

কবি ইয়েটস্ তখন রবীন্দ্রনাথকে সেখানকার সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য একটি হোটেলে একটি সভার আয়োজন করেন। এইচ্, জি, ওয়েলস্, কেম্ব্রিজের বাংলার অধ্যাপক জে, ভি, আণ্ডারসন, ভারতীয় শিল্পের গুরু হ্যাভেল, প্রভৃতি বহু মনীষী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইয়েটস্ ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বক্তৃতা দিতে উঠিয়া প্রথমেই তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের মত এক বিরাট প্রতিভাকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। তারপর তাঁহার কবিতার প্রশংসা করিয়া বলেন, ইংরাজী ভাষায় এমন কোন কবিতা নাই যাহার তুলনা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে হইতে পারে। এই বলিয়া তিনি 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি হইতে কয়েকটি কবিতা সেইখানে পাঠ করেন।

সেইদিন এই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলি শুনিয়া এমনি অভিভূত হইয়া

গিয়াছিলেন যে সেই সপ্তাহের মধ্যে কবি তাঁহাদের নিকট হইতে অনেকগুলি প্রশংসাপত্র লাভ করেন। তখন 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি কপি ইংরাজীতে টাইপ করাইয়া কয়েকজন সাহিত্যিক ও কবিকে দেওয়া হয়। তারপর রাদেনস্টাইনের চেষ্টায় ইহা 'ইণ্ডিয়া সোসাইটী' হইতে প্রকাশিত হইল এবং ইয়েটস্ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পুস্তকাকারে যখন 'গীতাঞ্জলি' বাহির হইল তখন রবীন্দ্রনাথ বিলাতে ছিলেন না, সেখান হইতে আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিলেন। বিলাতের যে সব কাগজে তাঁহার বইয়ের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল তাহা তিনি সেখানে বসিয়া পড়িয়াছিলেন।

বিলাতে তিনি বেশিদিন ছিলেন, সেখানে তাঁহার বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ভবিষ্যতে শান্তি-নিকেতনে আসেন এবং ইহার উন্নতিকল্পে বহু ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন সেখানকার সাহিত্য, সমাজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া সেদেশের লোকেদের অন্তরের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়েন।

গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইবামাত্র লণ্ডনের সুধীসমাজে যে আনন্দ ও চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল তাহা বিদেশী সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব! বিলাতের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত পত্রিকা 'টাইমস্'এ তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বাহির হয়। 'পোয়েট্রি' নামক কাগজ লিখিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে আগমন হেতু পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে সখ্য নিকটতর হইয়া আসিল।

বিখ্যাত ইংরাজ কবি এজরা পাউণ্ড লিখিলেন—ইংরেজী কাব্য এমন কি পৃথিবীর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রবেশ একটি বিশেষ ঘটনা।

মে সিনক্লেয়ার নামক একজন বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত বিখ্যাত ইংরাজ কবিদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন তাঁহাদের কাহারো রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনা হয় না।

তাহাছাড়া বার্ট্রাণ্ড রাসেল ও স্টপফোর্ড ব্রুক প্রমুখ বিলাতের বহু চিন্তাশীল মনীষী এই গীতাঞ্জলির প্রশংসা করেন।

এই সময় আমেরিকায় গিয়াও রবীন্দ্রনাথ বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান-সমাজ প্রভৃতি যে সব স্থানে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন সে সকল স্থান হইতেই কল্পনাতীত প্রশংসা তাঁহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল। সবাই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল ভারতের এই ঋষিকবিকে দেখিয়া, তাঁহার কবিতা পড়িয়া, এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া। সেখানে তিনি ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষা, ধর্ম্ম-দর্শন ও সংস্কৃতির উপর অধিকাংশ বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন।

আমেরিকা হইতে রবীন্দ্রনাথ তিনবার লণ্ডনে ফিরিয়া যান এবং সেখানকার ক্যাক্সটন হলে সেই বক্তৃতাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। লণ্ডনের ভাবুকমণ্ডলী ইহা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভারতবর্ষের বড়লাট এই সময় এক সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথকে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ঘোষণা করেন।

যাহা হউক এই সময় বিলাতের আরো বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু ইহার মাত্র এক মাস ছয়দিন পরে অর্থাৎ ১৩ই নবেম্বর ভারতে এই শুভ সংবাদ আসিল যে রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল পুরস্কার' পাইয়াছেন। তাঁহার গীতাঞ্জলি সেই বৎসর জগতের সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই সংবাদে ভারতের আকাশ বাতাস আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল। সারা পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথের নাম ছড়াইয়া পড়িল। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীজাতি ধন্য

হইল। জগতের ইতিহাসে সেদিন বাঙ্গালীর নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

জগদ্বাসী এই নোবেল প্রাইজকে শ্রেষ্ঠ সম্মান বলিয়া মনে করে। জড়-বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শান্তি এই পাঁচটি বিভাগে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য ৮০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডেন হইতে। স্যার আলফ্রেড নোবেলের নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে নোবেল প্রাইজ। তিনি সুইডেনবাসী বিখ্যাত বিজ্ঞানিক, ডিনামাইট তাঁহারই আবিষ্কার। তিনি যে মৃত্যুর পর বিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি সুইডিশ একাডেমির হাতে দিয়া যান তাহার সুদে এই প্রাইজ দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি গাড়ি চড়িয়া সঙ্গে দিনেন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে লইয়া শালবনে বেড়াইতে যাইতেছিলেন সেই সময় তাঁহার নিকট এই সুসংবাদ পৌঁছিল।

সেইদিন আশ্রমবাসীরা কবিকে লইয়া বিশেষ আনন্দ ও উৎসবে মাতিয়া উঠিল। ইহার কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে পাঁচশত বিশিষ্ট নরনারী একখানি স্পেশাল ট্রেনে করিয়া শান্তিনিকেতনে গিয়া কবিকে অভিনন্দন জানাইয়া আসিলেন। কিন্তু ইহাতে কবি খুশি হইতে পারেন নাই। কেননা বিদেশ হইতে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিবার পূর্ব্বে দেশবাসী তাঁহার কাব্যপ্রতিভার সম্যক্ সমাদর কোনদিন করে নাই বলিয়া তাঁহার মনে সেদিন দুর্জ্জয় অভিমান দেখা দিয়াছিল। তিনি দেশবাসীর এই অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন তা অসঙ্কোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি এমন সাধ্য আমার নেই।...

যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর, সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনপরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্যে বিধাতার মন্থনদণ্ড স্বরূপ হয়ে মন্দারপর্ব্বতের মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী তখন একথা বলা চলবে না যে, নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালবেন তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন; আর মালা গাঁথার ভার যাঁদের উপরে, তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি চারটি করে ফুল চয়ন করা।

কবিবিশেষের কাব্যে কেউবা আনন্দ পান, কেউবা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি; একথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পৌঁচেছে তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কিজন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখনো পর্য্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়াছিলেম তিনিই সমুদ্রের পশ্চিমতীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ

করবার জন্য যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন সে-কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ।

যাই হোক, যে কারণেই হোক্, আজ য়ুরোপ আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোন মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণীজনের রসবোধের মধ্যেই আছে। আমাদের দেশের সঙ্গে তার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোন রচনার গুণ বা রস বৃদ্ধি করতে পারে না।

অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করবো? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করবো? আমার আজকের এ দিন ত চিরদিন থাকবে না। আবার ভাঁটার বেলা আসবে, তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার ত ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।

তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি,—যা সত্য তা' কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া, তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। কোন কোন দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্য্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই। আমার রচনার দ্বারা আপনাদের যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রীতিলাভ করেছি তাঁরা আমাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই দুর্লভধনে পুরস্কৃত করেছেন। কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে নতুন সম্মানলাভের কোন যোগ্যতা আমি নতুনরূপে প্রকাশ করেছি একথা বলা অসঙ্গত হবে।

যিনি প্রসন্ন হলে অসম্মানের প্রত্যেক কাঁটাটি ফুল হয়ে ফোটে, প্রত্যেক পঙ্কপ্রলেপ চন্দনপঙ্কে পরিণত হয় এবং সমস্ত কালিমা জ্যোতিষ্মান হয়ে ওঠে, তাঁরি কাছে আজ আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি এই আকস্মিক সম্মানের প্রবল অভিমান থেকে তাঁর সুমহান বাহু-বেষ্টনের দ্বারা আমাকে নিভৃতে রক্ষা করুন।"

এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে এক সভা হয়। সুইডিস্ একাডেমী নোবেল পুরস্কারের যে কারুকার্য্য খচিত স্বর্ণপদক ও মানপত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন তাহা লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথকে সেখানে স্বহস্তে দান করেন এবং তৎসহ এক বক্তৃতায় কবিকে উচ্চপ্রশংসার দ্বারা সম্মানিত করেন।

ইহার পর ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে পুনরায় গবর্ণমেণ্ট হাউসে আর একটি বিশেষ সভা হয়, তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে 'ডি-লিট্' উপাধি দেওয়া হয়।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে যদিও নোবেল পুরস্কার পাইবার পর রবীন্দ্রনাথকে এই উপাধি দান করা হইয়াছিল তথাপি ইহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ভারতবর্ষে এই পুরস্কারের সংবাদ আসিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কথা উঠিয়াছিল এবং সে প্রস্তাব সেনেট কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল।

১৯১৪ সালে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনা তখন নিয়মিতভাবে সেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া সেইসময় যেসমস্ত কবিতা প্রবন্ধ গল্প তিনি লিখিয়াছিলেন তাহাতে ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বেশি মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছিল। সমাজের বহু গোঁড়ামি, অহমিকা ও বৃথাআদর্শের মূলে তিনি কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া সমাজপতিদের তীব্র সমালোচনা হইতেও তিনি নিস্তার পান নাই। এই সময় কবির বহু পুস্তক

পৃথিবীর নানাভাষায় অনূদিত হইতে থাকে। এইভাবে অতিক্রুত জগতের সর্ব্বত্র বিদগ্ধসমাজের মধ্যে তিনি প্রখ্যাত হইয়া উঠেন।

এই সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন করিয়া তিনি যে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার জন্য কবি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শুধু ইহাই নহে, মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত Phoenix schoolএর ছাত্রদের যখন ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন তখন রবীন্দ্রনাথ সেই সব ছাত্র ও শিক্ষকদের সাদরে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহার শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। তাহাদের মধ্যে নানাজাতি ও নানাধর্ম্মের ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন।

গান্ধীজী তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া যখন প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন করিতে আসেন তখন ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন, শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও শিক্ষক যদি একত্রে মিলিত হইয়া আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নিজহস্তে করেন তবেই ধীরে ধীরে সমগ্র জাতি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে।

গান্ধীজীর উপস্থিতিতে উহার পরীক্ষা আশ্রমে হইয়া গেল। সেই দিনটি শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে 'গান্ধী-দিবস' নামে অভিহিত হইয়া রহিল। এখনো প্রতিবৎসর এই দিনে সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষক মিলিয়া আশ্রমের যাবতীয় কাজ করেন··· রান্নাবান্না, ঘর-ধোয়া হইতে শুরু করিয়া মেথরের কাজ পর্য্যন্ত।

সেই সময়ে লর্ড কারমাইকেল একদিন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতন দেখিতে যান। তিনি ছিলেন তখন বাংলাদেশের গভর্ণর। আশ্রমবাসীরা তাঁহাদের আম্রকুঞ্জের মধ্যে একটি বেদীর উপর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। আজও ইহা 'কারমাইকেল বেদী' নাম লইয়া সেখানে শোভা পাইতেছে।

ইহার কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ১৯১৫ সালের ৩রা জুন রাজার জন্মদিন উপলক্ষে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'স্যার' এই গৌরবময় উপাধি লাভ করেন। কবির এই সম্মানে আবার বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইল।

এই সময় কবি তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য 'বলাকা' রচনা করেন।

স্বদেশে ও বিদেশে

কবির মন চিরদিন চঞ্চল। একস্থানে বেশিদিন থাকিলে তিনি হাঁপাইয়া উঠেন। তাই বিদেশ ভ্রমণের জন্য আবার তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ১৯১৬ সালের ৩রা মে তারিখে তিনি যাত্রা করিলেন জাপানের উদ্দেশে।

সেখানে কবি বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। কিন্তু জাপান কর্ত্তৃক চীনের লাঞ্ছনা দর্শনে তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। তিনি সেখানকার দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জাপানের প্রতি ভারতের বাণী' ও 'জাপানের আত্মশক্তি' নামে দুইটি দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। জাপানের কবি য়োন্ নোগুচি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা-দুইটির মর্ম্ম কাগজে প্রকাশিত করেন। ইহা পড়িয়া জাপান সরকার কবির প্রতি অসন্তুষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ সত্যের পূজারী। সত্যকথা বলিতে কখনো কোনদিন তিনি ভয় পান নাই—তাই ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি সেখান হইতে আবার আমেরিকায় চলিয়া যান এবং সেখানেও নানাস্থানে বহু বক্তৃতা করিয়া যশোমাল্যে বিভূষিত হন। এখানে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ন্যাশনালিজম্'। ইউরোপে তখন মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, জাতিতে জাতিতে আত্মঘাতী মরণযুদ্ধের উন্মত্ততা। সেই সময় কবি এই অত্যুগ্র জাতীয়তাবোধের নিন্দা করিয়া

আমেরিকায় বলিলেন—'ন্যাশনালিজম্ এক অপদেবতা, ইহার সমক্ষে জীববলি দিও না।'

কবির এই বক্তৃতাগুলি লইয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে তখন রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। যুধ্যমান সভ্যজগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এইভাবে তাহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিবার সাহস পৃথিবীতে আর কাহারো কখনো হয় নাই। তাই সবাই সেদিন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল কবির এই বাণী শুনিয়া। তিনি সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত এই দস্তুর সভ্যতার নগ্নরূপ জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহার সেই 'ন্যাশানালিজম্' গ্রন্থ পাঠ করিয়া কত লোকের হাত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই। ইংরাজী হইতে নানাভাষার ইহার টাইপকরা তর্জ্জমা যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ঘুরিত। ম্যাক্সপ্লোম্যান নামে একজন ইংরাজ যুবক ইহা পড়িয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দেন এবং ইহার পর হইতে তাঁহার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। অবশ্য ইহার জন্য সমর বিভাগ হইতে তাঁহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আমেরিকার আরো বহু দেশ ও বহু প্রতিষ্ঠান হইতে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করিয়া দশমাস পরে কবি পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে আবার যখন ভারতের রাষ্ট্রীয় গগনে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিল তখন কবি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; দেশের দুর্দ্দশায় তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি আবার রাজনীতিতে যোগ দিয়া ইহার প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেন।

সেই সময় গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব সৃষ্টি করিবার অপরাধে সন্দেহক্রমে বহু যুবককে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এই অবস্থায় থাকার ফলে তাহাদের কেহ বা আত্মহত্যা করিয়াছে,

কেহ বা পাগল হইয়া গিয়াছে বলিয়া নানা সংবাদ প্রতিদিন কাগজে বাহির হইতে থাকে। ইহা শুনিয়া কবির মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর শ্রীমতী আনি বেশান্ত যখন গভর্ণমেণ্টের এই কাজের নিন্দা করিয়া অন্তরীনে বন্দী হইলেন তখন কবি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ইহার প্রতিবাদকল্পে টাউন হলে এক সভা আহ্বান করিলেন, কিন্তু বাংলার লাট কোথাও ইহার প্রতিবাদসভা করিতে দিবেন না বলিয়া এক হুকুমজারী করিলেন। তখন রবীন্দ্রনাথ 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক এক প্রবন্ধ জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিয়া রামমোহন লাইব্রেরী ও এলফ্রেড থিয়েটারে পাঠ করিয়া সরকারের এই আদেশের উপযুক্ত জবাব দেন। তাঁহার এই তেজস্বিতায় সেদিন সমগ্র বঙ্গদেশ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

১৯১৭ সালে কলিকাতায় যে নিখিলভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীমতী বেশান্ত সভাপতিত্ব করেন। কবি তাহাতে নিজে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন এবং তাহার পর 'ভারতের প্রার্থনা' শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত ও আবৃত্তি শুনিয়া সবাই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কংগ্রেস শেষ হইয়া যাইবার পর কবি একদিন তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' ভবনে 'ডাকঘর' অভিনয় করেন। ইহাতে তিনি ঠাকুরদাদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। গান্ধীজী, তিলক মহারাজ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, আনি বেশান্ত প্রভৃতি আরো বহু কংগ্রেসনেতা এই অভিনয় দেখিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই রবীন্দ্রনাথ বেশান্ত-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি'র চ্যান্সেলার হন।

আবার ১৯১৮ সালের মে মাসে কবি আমন্ত্রিত হন অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি স্থানে যাইবার জন্য। কবি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন কিন্তু হঠাৎ একটি ব্যাপারে

সব ওলটপালট হইয়া যায়। কবি বিদেশ যাওয়া স্থগিত রাখিয়া তখন দার্জ্জিলিঙ চলিয়া যান। তারপর কিছুদিন সেখানে থাকিবার পর দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তিনি যেখানে গিয়াছেন সেখানেই রাজার ন্যায় আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। এই সময় তিনি বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং বহু প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি মাদ্রাজে গিয়া আনি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইউনিভারসিটিতে চ্যান্সেলার-রূপে বক্তৃতা দেন।

এইভাবে কিছুদিন ধরিয়া ভ্রমণ করিবার পর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া এম্পায়ার থিয়েটারে ও বসু ইন্‌স্টিটিউটে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। ইহা শুনিবার জন্য উভয়স্থানেই বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। এই সময় কবির মনে এক নূতন ধরণের বিদ্যালয়ের কল্পনা জাগে। তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা করেন শান্তিনিকেতনে।

১৯১৯ সালের প্রথমদিকে সরকারের এক নতুন আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী অহিংস সত্যাগ্রহ শুরু করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ হইতেছে —কর্ত্তব্যপালন করিতে গিয়া যদি কেহ আঘাত করে ত নীরবে তাহা সহ্য করিতে হইবে, এমন কি প্রাণও যদি যায় ত আঘাতকারীর গায়ে কেহ হাত দিবে না। তখনকার দিনে লোক এইরূপ তিতিক্ষা ও ক্ষমাধর্ম্মে অভ্যস্ত ছিল না বটে তবুও ইহা লইয়া একটা দেশব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ তখন এই রাজনৈতিক আন্দোলনের বাহিরে থাকিলেও ইহার দোষগুণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই শান্তিনিকেতন হইতে ১২ই এপ্রিল তারিখে তিনি গান্ধীজীকে একখানি চিঠি লেখেন।

ঠিক সেই সময় জালিয়ানাবাগে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড হয়।

অমৃতসহরের নিরীহ ও নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত সরকার বেপরোয়া গুলি চালাইতে থাকেন। উপরন্তু মাসাবধিকাল পাঞ্জাবের কোন সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হয় নাই, সামরিক আইন অনুসারে সমস্তরকম প্রচারকার্য্য তখন বন্ধ ছিল। কাজেই রবীন্দ্রনাথ এসবের কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু যেদিন এই সংবাদ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিল সেইদিন হইতে দেশের অপমানে তিনি নিজের মনে এমন যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন যে রাত্রে তাঁহার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। ভানুসিংহের এক পত্রে সেই সময় শান্তিনিকেতনের অত্যধিক গরমের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—"আকাশের এই প্রতাপ আমি এক-রকম সইতে পারি কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমে ছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্ছে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইছে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি।"

ইহাতে কবি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন যে তখন স্থির করেন দেশের নেতাদের লইয়া পাঞ্জাবে গিয়া উপস্থিত হইবেন। কিন্তু ইহাতে সকলের সহানুভূতি না পাইয়া তিনি তখন শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহার প্রতিবাদকল্পে এক বিরাট জনসভা আহ্বান করিয়া তাহাতে বক্তৃতা দিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি ব্যর্থ হইলেন। আইনের প্রতাপে ইহাও সম্ভব হইল না। তখন তিনি তাঁহার মনের বেদনা জানাইবার উপযুক্ত উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া গভর্ণমেণ্ট যে 'স্যার' খেতাব দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত

করিয়াছিলেন তাহা অসীম তেজস্বিতার সঙ্গে ত্যাগ করিলেন। এই উপলক্ষে ভারতের বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

"সামান্য স্থানীয় বিক্ষোভ শান্ত করিবার জন্য পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অভাবনীয় প্রচণ্ডতায় স্তম্ভিত হইয়া সহসা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি ভারতবর্ষের বৃটিশপ্রজা হিসাবে আমাদের অবস্থা কত অসহায়। অপরাধের অনুপাতে শাস্তির যে মাত্রাহীন পরিমাণ দুর্ভাগা জনসাধারণকে ভোগ করিতে হইয়াছে এবং যে প্রণালীতে এই শাস্তি তাহাদের উপর চাপান হইয়াছে, তাহাতে এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, দূর ও অদূর অতীতের কয়েকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ব্যতীত সভ্যরাষ্ট্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা মেলে না। মানুষের প্রাণনাশের জন্য ভয়াবহ দৃঢ়তায় সুগঠিত ব্যক্তির হাতে নিঃস্ব ও নিরস্ত্র জাতি আজ যে ব্যবহার পাইয়াছে তাহার পশ্চাতে নৈতিক সমর্থন দূরে থাক, সাময়িক রাজনৈতিক প্রয়োজনের দাবীর অজুহাত যে অর্থহীন একথা বলিতে আজ আমাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নাই। পাঞ্জাবে আমাদের দেশবাসিগণ যে লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে অবরুদ্ধ নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া তাহার সংবাদ আজ ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের প্রতি কোণে পৌঁছিতেছে—জাতির যে অন্তরকে আমাদের শাসকবর্গ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই অন্তর হইতে উত্থিত বেদনাদীর্ণ বিক্ষোভ আজ দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতেছে। যোগ্য ও স্মরণীয় শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ভাবিয়া সম্ভবত শাসকবর্গ নিজেদের অভিনন্দন জানাইতেছেন। প্রায় প্রত্যেক ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র শাসকবর্গের এই অবজ্ঞায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ কেহ আমাদের এই নির্য্যাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া পশুর মত পরিহাস করিতে পর্য্যন্ত দ্বিধা

করে নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বিন্দুমাত্র বাধা দেয় নাই, অথচ নির্য্যাতনের বেদনা ও বিচারের দাবীকে যাহারা ভাষা দিতে গিয়াছে বিনা সঙ্কোচে তাহাদের কণ্ঠ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। জানি, আমাদের এ আবেদন ব্যর্থ হইবে ; জানি, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উন্মাদনায় আমাদের গভর্ণমেণ্ট আজ নিজেদের শক্তি, ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। এ অবস্থায় আমাদের দেশের জন্য অন্তত এইটুকু আমি করিতে পারি—সর্ব্ব দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া আতঙ্কে ও বেদনায় নির্ব্বাক আমার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রতিবাদকে আমি ভাষা দিতে পারি। আজ এই অপমানের পটভূমিকায় আমাদের সম্মানের চিহ্ন আমাদের লজ্জাকে আরো প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। অতএব সর্ব্ব সম্মানভার পরিহার করিয়া আমাদের সেই সকল তথাকথিত নগণ্য দেশবাসীর পাশে আমি দাঁড়াইতে চাই যাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের বোঝা কোন মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। তাই যথাবিহিত দুঃখ ও সম্ভ্রমের সহিত আপনাকে আজ এই আবেদন জানাইতে বাধ্য হইতেছি, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজপ্রতিনিধির হাত হইতে মহামান্য সম্রাট প্রদত্ত 'নাইট' উপাধিরূপ যে সম্মান লাভের সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল, সেই সম্মানভার হইতে আজ আপনি আমাকে মুক্তি দিন।"

ইহার পর কবি বিশ্বভারতীর কার্য্য আরম্ভ করেন ১৯১৯ সালের ৩রা জুলাই 'বিশ্বভবন' উদ্বোধন করিয়া। এইখানে তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ইহার ভার গ্রহণ করেন। কবি সেই সময় শান্তিনিকেতনে শারদোৎসব অভিনয় করেন এবং ইহাতে তিনি নিজে সন্ন্যাসীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি শিলঙ্ পাহাড়ে বেড়াইতে যান এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মণিপুর নৃত্যের এক ক্লাশ

খোলেন। ইহার জন্য মণিপুর হইতে দুইজন অভিজ্ঞ শিক্ষক আনাইয়াছিলেন।

১৯২০ সালের ২রা এপ্রিল কবি গান্ধীজী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া গুজরাট সাহিত্যপরিষদের বার্ষিক উৎসবে এক অভিভাষণ পাঠ করেন। তখন তিনি সবরমতী আশ্রমে একদিন থাকেন এবং সেখান হইতে ভবনগর ও লিম্বডী রাজ্য পরিদর্শন করিতে যান। লিম্বডীর রাজা শান্তিনিকেতনের জন্য কবিকে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। সেখান হইতে আবার তিনি বম্বে, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যান এবং এই ভ্রমণ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফেরেন ১৯২০ সালের মে মাসে।

বিশ্বপরিক্রমা

এই মাসের ১১ তারিখেই তিনি পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে তিনি বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন এবং এইখানে তিনি ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করেন। এমন কি ইহার জন্য রাজপুরুষদের সঙ্গে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি শাসনের নামে ভারতে তখন যে সমস্ত মনুষ্যত্বহীন কার্য্য চলিতেছিল তাহার একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তির জন্য তাঁহাদের কাছে আবেদন করেন।

সেখান হইতে কবি প্যারিসে যান এবং সেখানে বহু মনীষীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হন। তারপরে তিনি হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, রটারডাম, এনটোয়ার্প, ব্রুসেলস্ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বক্তৃতা করেন এবং প্রত্যেক স্থানেই কল্পনাতীত সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন।

ইহার পর তিনি তথা হইতে একেবারে সোজা আমেরিকায় চলিয়া

যান। সেখানে নিউ ইয়র্ক, হার্ভার্ড, চিকাগো, টেকসাসের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া যেরূপ সম্মান লাভ করেন তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা কঠিন।

আমেরিকা হইতে ১৯২১ সালের মার্চ্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ আবার আমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপে ফিরিয়া আসেন। এবং ফ্রান্স, স্ট্রাসবুর্গ, জেনেভা, জার্ম্মানী, হামবুর্গ, সুইডেন, ভিয়েনা, প্রাগ প্রভৃতি স্থানে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষায়তনে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বক্তৃতা দেন। এই সব স্থানে জ্ঞানী, গুণী, ঋষি বলিয়া রবীন্দ্রনাথ যে পূজা ও ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন তাহা দেবদুর্ল্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জার্ম্মানীতে অবস্থানকালে সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী কবির একষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে জার্ম্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী উপহার দেন। ইঁহাদের আন্তরিকতায় কবি আনন্দিত ও বিচলিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—I truly feel that I have had my second birth in the heart of the people of that country, who have accepted me as their own.

ইহার পর তিনি সুইস একাডেমী কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া নোবেল সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দেন। সেই সভায় আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে উপসালার আর্চ বিশপ বলেন—The prize for literature is intended for the writer who combines in himself the artist and the prophet. None has fulfilled these conditions better than Rabindranath Tagore.

দীর্ঘদিন ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া কবি ১৯২১ সালের ১৬ই জুলাই আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম বিশ্বভারতীকে একটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে

পরিণত করিবার পরিকল্পনা করিলেন। তিনি দেখিলেন বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিতে হইলে শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভব নহে। তাঁহারই ভাষায় বলিতে গেলে "আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটেনি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই।···আমার প্রার্থনা এই যে ভারত আজ সমস্ত পূর্ব্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্ত্তে সে বিশ্বের সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাবে।"

কবি ইহার জন্য অক্লান্ত চেস্টা করিতে লাগিলেন। এই কল্পনা একদিন সত্যে পরিণত হইল। 'বিশ্বভারতী' নাম সার্থক হইল। বিশ্বভারতী আজ বিশ্বের সকল শিক্ষার মিলনক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে আজ চীনা, জাপানী, হিন্দী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, ফারসী, ল্যাটিন, জার্ম্মান, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার শিক্ষা দেওয়া হয় তত্তদ্দেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা।

এই সময় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলেন, "তোমার গুণে বাঙলা চিরদিনই মুগ্ধ, ভারত গৌরবান্বিত; এখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত।"

কবি তখন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "পঞ্চাশোর্দ্ধে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পৌঁছলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃক্রোড় পূর্ব্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবী নেই, কর্ম্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ

পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্ব্বাদ লাভ করেছি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেছি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ববাণীর প্রসন্নতা লাভ করেছি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষ আনন্দ করছেন।”

ইহাতে একটু অভিমানের সুর ছিল সত্য। কেননা বাংলা ভাষার কবি তাঁহার দেশবাসীর নিকট হইতে তখন যেভাবে আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন তাহার সহস্রগুণ বেশি লাভ করিয়াছিলেন বিদেশে, যাহারা বাংলা ভাষা বোঝে না তাহাদের নিকট হইতে। তাই দেশবাসীর উপর যদি তিনি একটু অভিমান করিয়াই থাকেন তাহা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে।

যাহাহউক এই সময় মিসেস্ স্ট্রেট্ নামক জনৈক মার্কিন ভদ্রমহিলার নিকট হইতে পল্লীসংস্কার কার্য্যের জন্য কবি বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পান। ইতিপূর্ব্বে শান্তিনিকেতনের নিকট সুরুল নামক স্থানে কবি যে পল্লীসংস্কার-কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন তাহার উন্নতিকল্পে এই টাকা তিনি দিয়াছিলেন। ১৯২২ সালের ১১ই জানুয়ারী কবি এই পল্লীসংস্কার-কেন্দ্রটির নাম দেন শ্রীনিকেতন এবং বিশ্বভারতীর একটি বিভাগরূপে ইহার শুভ উদ্বোধন করেন।

ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে ৭ই পৌষ অর্থাৎ ইংরাজী ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২১, শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবদিনে তিনি নোবেল প্রাইজ উপলক্ষে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ এবং সমস্ত বাংলা পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব ‘বিশ্বভারতী’কে দান করেন। তাহা ছাড়া বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার, শান্তিনিকেতনস্থ জমি, মায় তদুপরি যাবতীয় ইমারতাদি আইনসম্মতভাবে বিশ্বভারতীর হস্তে সমর্পণ করেন।

তারপর কবি দেশ ও বিদেশ হইতে ইহার জন্য বহু সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্বভারতীর কল্পনা পৃথিবীর সকল দেশে

সাদরে গৃহীত হইয়াছে। তাই কবির আহ্বানে চীন, জাপান, ইতালী, পারস্য, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া বিশ্বভারতীতে যোগদান করিয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে এক আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষাদানে কখনো কার্পণ্য করেন নাই।

বিশ্বভারতী স্থাপনের পর আবার বাহির হইতে কবির নিমন্ত্রণ আসে। দেশে দেশে লোক পূজার অর্ঘ্য সাজাইয়া বসিয়া ছিল তাঁহাকে বরণ করিবার জন্য। তিনি আবার বাহির হইলেন পৃথিবী-ভ্রমণে। ১৯২৪ সালের ২১শে মার্চ্চ তিনি চীনে যাত্রা করেন। পথে ও চীনে নানাস্থানে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তারপর সেখান হইতে জাপানে যান এবং সেখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর বক্তৃতা দেন।

জাপান হইতে তিনি সোজা দেশে ফিরিয়া আসেন কিন্তু ওই বৎসরের শেষের দিকে কবি আবার আমেরিকার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে যান। সেখান হইতে ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ইতালী গমন করেন এবং জেনোয়া, মিলান, ভেনিস্, ব্রিণ্ডিসি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ১৯শে ডিসেম্বর 'ইণ্ডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসে'র প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তারপর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আবার ১৯২৬ সালের ৩১শে মে তিনি ইতালী যান এবং সেখানকার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্রোচে ও মুসোলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সময় তিনি রোমে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। রোম হইতে কবি ফ্লোরেন্স, টুরিন, ৎসুরিক, লুসার্ণ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। প্রত্যেক জায়গায় তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা করেন।

সেখান হইতে কবি নরওয়ে যান। অসলোতে নরওয়ের রাজা

কবিকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সেখানে নানা অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন।

এখান হইতে কবি স্টকহলম্, কোপেনহেগেন প্রভৃতি স্থান হইয়া আবার জার্ম্মানীতে যান। সেখানে নানাস্থানে প্রবন্ধ পাঠ করেন ও বক্তৃতা দেন। জার্ম্মানীর প্রেসিডেণ্ট হিন্‌ডেন্‌বার্গের সহিত তখন কবির আলাপ হয়, তিনি কবিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। তারপর সেখানে হইতে বলকান রাজ্যসমূহ ভ্রমণ করিয়া মিশরের পথ দিয়া কবি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন।

ইহার পর ১৯২৭ সালে জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি জাভা, সুমাত্রা, বলি, মালাক্কা প্রভৃতি দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে কল্পনাতীত সম্মান লাভ করেন।

১৯২৮ সালে বিলাতের 'হিবার্ট' কর্ত্তৃপক্ষরা রবীন্দ্রনাথকে বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। এই সমিতি জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করেন এবং পারিশ্রমিক দেন। রবীন্দ্রনাথ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কিন্তু হঠাৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আবার কানাডার 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' হইতে আহূত হইয়া তিনি ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় রওনা হন।

কবি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর বরোদার গাইকোয়াড় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে বক্তৃতা করিতে যান এবং ঐ বৎসরই তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কবি আবার 'হিবার্ট লেকচারার' নির্ব্বাচিত হন এবং 'মানুষের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দেন। এইবার লণ্ডনে কবি রাজোচিত সমাদরে সম্বর্দ্ধিত হন এবং নানাস্থানে বহু বক্তৃতা করিয়া পরে জার্ম্মানীতে চলিয়া যান। মিউনিকে অবস্থানকালে তিনি

ললিতকলার উপর একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য বহুস্থানে এই সময় তিনি আরো বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই বৎসর কবি প্যারিসে তাঁহার অঙ্কিত ছবির একটি প্রদর্শনী খোলেন। দেশবিদেশ হইতে বহু রসগ্রাহী ব্যক্তি ইহা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য কবির এই ছবিগুলি সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। সেখান হইতে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় যাত্রা করেন এবং মস্কোতে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

দিগ্বিজয়ী বীরের মত তিনি পৃথিবীর সকল রাজ্য জয় করিয়া বেড়াইয়াছেন—কোথাও তাঁহার পরাভব ঘটে নাই। যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত মনীষা পূজিত হইয়াছে; তিনি মানুষের হৃদয় জয় করিয়াছেন।

এই সময় তিনি যে যশ, অর্থ, সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন পৃথিবীর আর কোন ব্যক্তির ভাগ্যে কখনো তাহা সম্ভব হয় নাই। কত উপাধি, কত উপঢৌকন, কত পূজা, কত আরতি তাহার ঠিক নাই। গ্রন্থের প্রারম্ভে সে সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়াছি।

কিন্তু এসময়ে কবি একবারও তাঁহার বিশ্বভারতীর কথা বিস্মৃত হন নাই। সর্ব্বদাই ইহার চিন্তা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া থাকিত। তাই মূল্যবান মণিমুক্তার মত নানা রাজ্য হইতে পণ্ডিতদের চয়ন করিয়া আনিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশ্বভারতীকে সাজাইয়াছিলেন। যে দেশের যাহা কবির চোখে ভাল লাগিয়াছে সব আনিয়া তিনি একত্রিত করিয়াছেন এই বিশ্বভারতীতে—কোন জাত, কোন ধর্ম্ম, কোন লোকাচার মানেন নাই। মৌমাছির মত বিশ্বের নানা ফুল হইতে মধু আহরণ করিয়া আনিয়া কবি মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কলাভবন, সঙ্গীতভবন, শ্রীভবন প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন বিভাগ তাই মানবমনের বিচিত্র রসধারায় পরিপূর্ণ। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনক্ষেত্র এই

বিশ্বভারতী। জ্ঞানের জগতে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত বিশ্ব যে এক, এ সেই বিরাট কল্পনার সুসম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকের বাস্তবরূপ। ছন্দে, গানে, নৃত্যে মধুর ও চিরসুন্দর। পূর্ণ জীবনের আদর্শ এই বিশ্বভারতী। জ্ঞান ও কর্ম্মের সংযোগে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাহারি প্রতীক।

১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কবির বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হইল। সেই উপলক্ষে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী'র আয়োজন হয়। ইহাতে সারা ভারতবর্ষে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে, এমন কি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর অঞ্চল হইতেও বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতার টাউনহলে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। সাত দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিয়াছিল। ১৯৩১ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হইতে জয়ন্তী-সপ্তাহ শুরু হয়। কলিকাতায় তখন একটা রীতিমত হৈচৈ পড়িয়া গেল। মেলা, প্রদর্শনী, কথকতা, যাত্রা, কীর্ত্তন, বাউলগান, সারিগান, ঝুমুর নৃত্য, বক্তৃতা, রবীন্দ্রনাথের গানের জলসা, রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয় প্রভৃতি বিচিত্র উৎসবে সমস্ত নগরী আনন্দোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়া গেল।

২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে টাউনহলের সম্মুখের প্রাঙ্গণে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়া কবিকে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। ভারতবর্ষের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—পৃথিবীর সকল জাতি—কবিকে অভিনন্দন জানায়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন অগণিত ভক্ত সমবেত হইয়াছে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য। সকলের মুখেই কি সুগভীর শ্রদ্ধার ছবি! বাংলার কবিকে সমগ্র জগৎ পূজা করিতেছে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালীর বুক গর্ব্বে স্ফীত হইয়া

উঠিল। কলিকাতার নাগরিকদের পক্ষ হইতে, প্রথমে কবিকে কর্পোরেশনের মেয়র কর্ত্তৃক এক মানপত্র দেওয়া হয়। তারপর বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলন হইতে, হিন্দী সাহিত্যপরিষদ হইতে প্রবাসী সাহিত্য-সম্মেলন হইতে, জয়ন্তী সমিতি হইতে মানপত্র দেওয়া হয়। ইহাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে, ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ হইতে এবং পৃথক্‌ভাবে আরো বহু মানপত্র পরে কবিকে দেওয়া হইয়াছিল। 'গোল্ডেন বুক অব্ টেগোর' কবিকে এই দিন উপহার দেওয়া হয়। দেশবাসীর পক্ষ হইতে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং কবি তাহার উত্তরে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

দেশবাসিগণের অভিনন্দন

কবিগুরু

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্ম্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল সাহিত্যাচার্য্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই

বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাতে দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্ব্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। *তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার* নতশিরে নমস্কার করি।

কবির উত্তর

"বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এযে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত, একথা আমার মন সহজে ও সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্য্যের আলোক বাষ্পসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে ছায়ায় ম্লান কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতই বাধা বিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু না কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছে—সেইসঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাট রূপে। সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও ; উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনও বুঝি-বা তাঁহার অগোচরেও সুর পৌঁছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে ; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনও হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভাল ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালায় শেষগ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টিসম্মুখে সমগ্র-ভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেই জন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত—"আমি গ্রহণ করিলাম"। সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটি বিস্তর আছে, সাধনায় কোন অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি চুনিয়া চুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্ম্মের যে সত্যরূপ যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশ তাঁহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বরদান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের

প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অন্ধকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্ম্মের গতিবেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত হইতে তাই সবিনয়ে দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আমার শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।”

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে হিজলী বন্দীনিবাসে অন্তরীন অবস্থায় বাঙলাদেশের যেসব যুবক ছিল তাহাদের কয়েকজনের উপর সামান্য কারণে পুলিশ গুলি চালায় এবং নির্ম্মম প্রহার করে। এই সংবাদে বৃদ্ধ কবির চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। তিনি কলিকাতার ময়দানে, মনুমেণ্টের পাদদেশে দাঁড়াইয়া লক্ষাধিক নরনারীর সম্মুখে সরকারের এই ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন। মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেন, “প্রথমে বলে রাখা ভালো আমি রাষ্ট্রনেতা নই, আমার কর্ম্মক্ষেত্র রাষ্ট্রআন্দোলনের বাইরে। কর্ত্তৃপক্ষের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি

নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালান ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার বলবার, সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।"

ইহার পর কবির জীবনের শেষ দশটি বৎসর অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও উত্তেজনাপূর্ণ। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য হয়ত সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। কিন্তু দেশের সর্ব্ববিধ ব্যাপারে—কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সামাজিক, কি শিক্ষাবিষয়ক—তাঁহার উপদেশ ও বাণী সর্ব্বদা দেশবাসীর অন্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইয়াছে।

এই সময়ের কয়েকটি মাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

তিনি ১৯৩২ সালে পারস্যসম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বিমানযোগে তাঁহার রাজ্য পরিদর্শন করিতে যান। এই উপলক্ষে তিনি সেখানে সম্রাটোচিত অভিনন্দন লাভ করেন। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ সেখানকার সমস্ত স্কুল কলেজ আফিস আদালত কয়েকদিন বন্ধ ছিল।

ঐ বৎসর মহাত্মা গান্ধী জারবেদা জেলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা উপলক্ষে অনশনব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তেইশ দিন পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া যখন মৃত্যুকে বরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছিলেন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া একটি গান গাহিয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনশন ভঙ্গ করেন।

সেই বৎসরই তিনি ১৯৩২-৩৩ সালের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক রামতনু লেকচারার নিযুক্ত হন।

আবার ১৯৩৫ সালে কবি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়া সেইখানে যান।

১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট উপাধি: দান করেন।

১৯৩৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণী সভায় রবীন্দ্রনাথ ওজস্বিনী ভাষায় এক বক্তৃতা দেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা এই প্রথম।

ইহার পর ২১শে ফেব্রুয়ারী কবি চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিংশতিতম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন।

১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ্চ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিট উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন।

এই বৎসরই নোগুচির পত্রের উত্তরে কবি জাপানের পররাজ্য-লিপ্সার দারুণ নিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাহা লইয়া দারুণ মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল উভয় কবির মধ্যে।

ইহার পর ১৯৩৯ সালের ৮ই অগাস্ট ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্র-নায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর অনুরোধে কবি ১৬৬নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে 'মহাজাতি সদনে'র ভিত্তি স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বাংলাদেশের চিরকাল স্মরণ রাখা উচিত।

"আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালি জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা' সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়,: যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, কর্ম্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক,

বাঙলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তরূপ গ্রহণ ক'রে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধির ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাঙলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক আত্মাভিমানের সর্ব্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক এই কল্যাণইচ্ছা এখানে সঙ্কীর্ণচিত্ততার উর্দ্ধে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হোতে থাক্—

বাঙালির পণ বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান !
বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান !

সেই সঙ্গে একথা যোগ করা হোক বাঙালির বাহু ভারতের বাহুকে বল দিক, বাঙালির বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি-সাধনায় বাঙালি স্বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে।"

যিনি একদিন লিখিয়াছিলেন "সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে", যিনি লিখিয়াছিলেন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়

ভালবাসি”, সেই বাংলার কবি, বাংলির কবির মুখে তাঁহার দেশের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জয়গান শুনিয়া সেদিন বাঙলাদেশ ধন্য হইল—বাঙালি জাতি কৃতকৃতার্থ হইল!

তারপর যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ পড়িয়া কবির মনে প্রথম ছন্দের দোলা লাগিয়াছিল তাঁহার স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন আপন হাতে করিবার জন্য তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া ছুটিয়া গিয়াছিলেন মেদিনীপুরে। একদিন যিনি কবির হৃদয়ে গীতিমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন আজ বহুদিন পরে কবি আবার তাঁহারই স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন! ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দিনটি কবির জীবনের এক অতি পুণ্যদিন!

এই দিন তিনি বলিয়াছিলেন, “‘পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এইসঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ ঘটল যে বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!”

ইহার পর কবি তাঁহার জীবনের শেষ সম্মান লাভ করেন ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট। সেদিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি, লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বাঙলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও উহা পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সুদূর দেশে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান দেখাইবার জন্য বর্ত্তমান পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র হইতে বিশেষ উপাধি-বিতরণ-সভার আয়োজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম! ইহাতে গ্রহীতার চেয়ে দাতাই বেশি সম্মানিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নামে ইহার সঙ্গে জড়িত হওয়াতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ইহার স্মৃতি চিরকাল পৃথিবীর লোকের মনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। হায়, যিনি কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করেন নাই, কত বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁহাকে সম্মান দিয়া নিজেদের সম্মান বাড়াইল! পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃষ্টান্তও এই প্রথম!

আবার ২৫শে বৈশাখ ঘুরিয়া আসিল। কবির জীবনের আশি বৎসর পূর্ণ হইল। ১৩৪৮ সালের ১লা বৈশাখ হইতে তাই আবার দেশবাসী আনন্দ-উৎসবে মাতিল। এ আনন্দ পূর্ণতার—দীর্ঘদিন ধরিয়া কবি যে শুধু গঙ্গার বহুধারার মত বাঙলা তথা ভারতভূমির জ্ঞানের ক্ষেত্রে উর্ব্বরতা দান করিয়াছেন, তাহাতে ফুল ফুটাইয়াছেন, ফল ফলাইয়াছেন—এ আনন্দ সেই দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার তপঃসিদ্ধি। শান্তিনিকেতনে কবির 'উত্তরায়ণ' বাসভবনের সম্মুখে দেশবাসীর সম্মিলিতকণ্ঠে কবির জয়গান ধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কবির মন সে আনন্দে সাড়া দিতে পারিল না। যে দেশকে তিনি মায়ের মত আজীবন ভালবাসিয়াছেন তাহার অপমানে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। শাসকদের বিরুদ্ধে তিল তিল করিয়া যে অসন্তোষ তাঁহার মনে এতদিন ধরিয়া জমা হইয়াছিল আজ তাহা জলপ্রপাতের মত সকল সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। চরম আনন্দের দিনে কবি তাঁহার অন্তরে চরম ব্যথা পাইলেন। তাই যাহারা আমাদের দেশের সকল সুখ দস্যুর মত হরণ করিয়া লইয়াছে তাহাদের তিনি মর্ম্মান্তিক অভিশাপ দিলেন। কবি দেশের দিকে তাকাইয়া তাঁহার জীবনের শেষে জন্মদিনে তাই 'সভ্যতার সংকট' নামক একটি প্রবন্ধ দেশবাসীকে উপহার দিলেন। ইহা যেন ভারতবর্ষের নিপীড়িত অন্তরাত্মার জমাট অশ্রু। ইহার ভাষা শুধু অন্তরে অনুভব করিবার, মুখে প্রকাশ করিবার নয়। তিনি বলিলেন, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।

কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জ্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন খাঁটি দেশপ্রেমিক। তিনি দেশকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। সেইজন্য জীবনের শেষ-জন্মদিনে দেশের এই দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। ইহাই কবির একাশীতিতম জন্মোৎসবের শেষ আশীর্ব্বাদ।

ইহার কয়েকদিন পরেই আবার তিনি মিস্ র‍্যাথবোর্ণের চিঠির উত্তর দিয়াছিলেন রোগশয্যা হইতে।

মিস্ র‍্যাথবোর্ণ নামে একটি মহিলা বিলাত হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে একখানা চিঠি লেখেন তাহাতে ভারতবর্ষকে তিনি অতি অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করেন। ইহা পড়িয়া কবি অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা অনুভব করেন। জওহরলাল নেহেরু তখন কারাগারে বন্দী ছিলেন বলিয়া সে পত্রের উত্তর দিতে পারেন নাই, তাহার উত্তর দিয়াছিলেন কবি নিজে অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায়—

"আজ যে ইংরাজকে আমরা চাইনা, তাহাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা তাঁহারা বিদেশী বলিয়া নহেন, তাহার কারণ আমাদের কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে তাঁহারা চরম বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখাইয়াছেন। স্বদেশে পুঁজিপতির পকেট ভর্ত্তি করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহারা আহুতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, অন্যায় অবিচারের পর ভদ্র ইংরাজ অন্তত নীরব থাকিবেন—আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য আমাদের প্রতি অন্তত কৃতজ্ঞ থাকিবেন, কিন্তু আহতকে অপমান করিয়া কাটা ঘায়ে নুনেরছিটা দিয়া তাঁহারা সৌজন্য ও শালীনতার শেষ সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।"

ইহাই শাসকদের বিরুদ্ধে কবির শেষ অভিযোগ—দেশের কল্যাণার্থে শেষ যুদ্ধ! ইহার পর হঠাৎ কবির শরীরের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া পড়িল। অতিবার্দ্ধক্যের সঙ্গে কালের অমোঘদূত ছদ্মবেশী মৃত্যুর রূপে চুপি চুপি আসিয়া তাঁহার অন্ত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কবি নির্ম্মল দেহ ও বিশুদ্ধ আত্মা লইয়া ইহার সম্মুখীন হইলেন ঋষির মত!

শান্তিনিকেতন হইতে কবিকে কলিকাতায় তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে লইয়া আসা হইল। ১৯৪১ সালের ২৫শে জুলাই অপরাহ্ণে আশ্রমবাসীরা কবিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া শেষবারের মত গাহিল 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। কবি তাঁহার এই অতিপ্রিয় গানটি শুনিতে শুনিতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। হায়, তখন কে জানিত যে ইহাই তাঁহার শেষ বিদায়—আর সে আশ্রমে তিনি ফিরিবেন না—আর তাঁহার হাসি, তাঁহার গান, তাঁহার কণ্ঠস্বর শান্তিনিকেতনে ধ্বনিত হইবে না, তার আকাশে, বাতাসে, পত্রেপুষ্পে, আলোকে আঁধারে!

তিনি ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। তাই মৃত্যুকে কোনদিন ভয়ের চোখে দেখেন নাই। তাই চৈতন্য অবলুপ্ত হইবার শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি লিখিয়াছিলেন—

> "দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
> এসেছে আমার দ্বারে।
> একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
> কষ্টের বিকৃত ভাণ, ত্রাসের বিকট ভঙ্গী যত,
> অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
> যতবার ভয়ের মুখোস তার করেছি বিশ্বাস
> ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।···"

সাধনার ক্ষেত্র হইতে তিনি আসিলেন তাঁহার জন্মস্থানে যেন চির-বিদায় গ্রহণ করিতে। সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই মাটি তাঁহাকে শেষ

বিদায়ের আগে যেন শুধু একবার মায়ের মত সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল, তারপর নিয়তির অমোঘ নিয়মে তিনি যাত্রা করিলেন সেই চির-প্রয়াণের পথে, যুগ যুগ ধরিয়া যে জ্যোতির্ম্ময় পথে মহামানবেরা যাত্রা করিয়াছেন।

১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট বেলা ১২টা ১২ মিনিটের সময় হঠাৎ বাংলাদেশ শুনিল—তাহাদের 'রবি' আর নাই!

মুহূর্ত্তে সব স্তব্ধ হইয়া গেল—যেন এইমাত্র বজ্রাঘাত হইল বাংলা দেশের মর্ম্মস্থানে!

* * * * *

যে কবি তাঁহার জীবনের প্রথমে লিখিয়াছিলেন—

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

সেই কবি এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় আবার শেষ লেখা লিখিয়া গেলেন—

"আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্তের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাবো জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাবো মানুষের শেষ আশীর্ব্বাদ।"

———